উমাবনম্

অবস্থা বিপর্যয়ে পড়ে মানুষ মাঝে মাঝে এমন ভুল করে যা তার জীবনের সব হিসাব নিকাশ ওলট্ পালট্ করে দেয়। এমনি কয়েকটি ভুলের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লেখা চারখানি নাটিকার সঙ্কলন 'উমাবনম্'।

জীবনের আকস্মিকতার সূত্র ধরে নাটকের কাহিনীগুলি এগিয়ে চলেছে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও স্বধর্মকে অনুসরণ করে—বিভিন্ন পরিণতির দিকে। তবু এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হয়েছে কাহিনীগুলিতে।

ভুলে ভরা সংসারের পথ পরিক্রমায় যারা পথ ভুলে বিপথে ছিটকে পড়ে, পথের শেষে কেউ কি দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁদের ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দিতে? এই একটি প্রশ্নে চারখানি নাটকই এক সমন্বয়ের সূত্র খুঁজেছে।

সূচী ঃ

উমাবনম্

গোপীনাথ নন্দী

প্রথম সংস্করণ

অক্টোবর, ১৯৫৫

প্রকাশক :

ডি. মেহ্‌রা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০ ০১২

৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১

১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪

৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : দরিয়াগঞ্জ : নতুন দিল্লী ১১০০০২

প্রচ্ছদশিল্পী :

রণজিৎকুমার মল্লিক

মুদ্রক :

ফণিভূষণ রায়

প্রবর্তক প্রিন্টিং অ্যাণ্ড হাফ্‌টোন লিমিটেড

৫২/৩ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০১২

দাম :

দশ টাকা

ক্ষ্যাপাজী তারানাথ ব্রহ্মচারী'র

সমাধি বেদীতে

গ্রন্থখানি

আমার

পূজার্ঘ্য

এই সংকলনের নাটিকাগুলির মধ্যে 'শব্দভেদী বাণ' আমার প্রথম রচনা। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতা ছোট আদালতের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত সেন্টিনারী সুভেনীরের জন্য এই নাটিকাটি বিশেষ-ভাবে লিখিত হয় এবং কলিকাতা ছোট আদালতের শতবর্ষ-পূর্তি পত্রিকায় 'বিচারক' নামে নাটিকাটি প্রকাশিত হয়। আদালতের পত্রিকায় প্রকাশের সময় তদানীন্তন মুখ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে আমার মূল রচনা কিছুটা পরিবর্তন করতে হয়েছিল; এই সংকলনে আমার মূল রচনাটিই নাম পরিবর্তন করে প্রকাশ করা হল। 'সন্ন্যাসীর গীত' নাটিকাটিও পুরাতন ও বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নাটিকাটি পাঠ করে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত অমরেশচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে একখানি পত্র লেখেন এবং সেই পত্রের একাংশে মন্তব্য করেন—'আপনার আখ্যায়িকা অবাস্তব হইয়াছে, বিচারকের অংশে। আদালতের বাহিরে সে চাবুক লইয়া শাসন করে না।' মাননীয় বিচারপতির মন্তব্য আমি মাথা পেতেই নিয়েছিলাম। এখন নতুন করে এই সংকলনে নাটিকাটি অন্তর্ভুক্ত করবার সময় একটি কথা বলবার সুযোগ নিচ্ছি। বিচারকের দণ্ডভোগ করবার পর আসামী যখন আবার সমাজে ফিরে আসে, সমাজ তখন আর তাকে সহজভাবে নিতে চায় না। অপবাধ আছে, তাব জন্য দণ্ডবিধান আছে, আর দণ্ডভোগেব পর কি আছে? এই নাটিকায় আছে সেই পরের কথা। অবসর প্রাপ্ত বিচারক আর আদালতেব নন, তিনি তখন সমাজেরই একজন, তাঁর হাতের চাবুক সমাজের চাবুকরূপেই দেখাতে চেয়েছি।

এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত অপর দুটি নাটিকা 'উমাবনম্' ও 'খোকা হারিয়ে গেল' ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। তবে দুটি নাটিকাই 'চন্দ্রলোকের' সাহিত্য বাসরে সুধী সমাবেশে পঠিত হয় এবং সুধীজনের অনুমোদন পাবার পর এখন প্রকাশ করা হচ্ছে।

'খোকা হারিয়ে গেল' নাটিকাটি সম্বন্ধে দুটি কথা বলবার আছে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে ক্ষ্যাপাজী তারানাথ ব্রহ্মচারীর কি ভূমিকা ছিল, আজকের দিনের পাঠকের হয়ত তা জানা নেই। শ্রীগুরু বামদেবের আদেশে ক্ষ্যাপাজী তারানাথ বিপ্লবীদের মধ্যে আপনার সাধনার ক্ষেত্র বেছে নেন। বিপ্লবীদের মধ্যে যা ছিল তাঁর ভূমিকা, যা ছিল তাঁর শিক্ষা, সবই ছিল এতই গোপন এতই অলৌকিক যে, ইতিহাসের পাতায় তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'সিদ্ধ সাধক

তারাক্ষ্যাপা' গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠা থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধার করে দিলাম—'ভিয়েনা প্রসঙ্গে ক্ষ্যাপাবাবাকে প্রশ্ন করলে ইসারায় তিনি যা ব্যক্ত করেন, তাতে মনে হয় যখন স্বর্গীয় ভিঠলভাই প্যাটেলের রোগশয্যার পাশে শুশ্রূষারত সুভাষ উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন বোধ করছিলেন, সেই সময় শ্রীশ্রীং ক্ষ্যাপা সুভাষের অতি সন্নিকটে ছিলেন (এই উপস্থিতি কায়িক নয়)। সুভাষের কাছে এই ইসারা উপস্থিত করে কোন প্রতিবাদ পাইনি এবং—আমি যদি ভুল বুঝে না থাকি তবে যা পেয়েছি সেটা সমর্থনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।' অনেকের বিশ্বাস নেতাজীর অন্তর্ধানের সময়ও ক্ষ্যাপাবাবা সূক্ষ্ম দেহে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন; কিন্তু তার কোন ইতিহাস নেই। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬ সালে পুলিশ স্বরূপগঞ্জ আশ্রম থেকে ক্ষ্যাপাবাবাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে নোয়াখালি জেলায় হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখে। অন্তরীণ করার কারণ সম্বন্ধে ক্ষ্যাপাবাবা বলেছিলেন—বাঘা যতীনের বিপ্লবে সাহায্য করাই বোধ হয় এর কারণ। তারপর ক্ষ্যাপাবাবার দীর্ঘ বিচিত্র কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে যা চিরকাল সকলের অগোচরে রয়ে গেল, তা হল শ্রীগুরু বামদেবের আদেশে বিপ্লবীদের মধ্যে সাংখ্যযোগের যে বীজ তিনি বপন করে করে সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। যে বীজ তিনি বপন করেছিলেন, তার ফসল আজ আর কোথাও পাওয়া যাবে না, ইতিহাসেও নয় বাস্তবেও নয়। সেই হারানো ফসলের সন্ধানে 'খোকা হারিয়ে গেল'. নাটিকায় শেখরের চরিত্র চিত্রিত। ক্ষ্যাপাবাবার যে শিক্ষা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, ক্ষ্যাপাবাবাকে স্মরণ করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে তাঁরই শিক্ষার একটি রেখাচিত্র দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র—এই নাটিকায় শেখরের চরিত্রে।

গোপীনাথ নন্দী

উমাবনম্

নাটকের পাত্র পাত্রী

ডাঃ সুরেশ চন্দ্র

মহেশ চন্দ্র

নিয়োগী সাহেব

সরমা

উমা

॥ উমাবনম্ ॥

[শহরের স্ত্রীচিকিৎসা বিশারদ ডাঃ সুরেশচন্দ্র চন্দ্রের গৃহের সদরদ্বার সংলগ্ন নাতিপ্রশস্ত চলন ঘর। যেদিকে সদরদ্বার তার বিপরীত দিকে দুই পাশে দুটি মোটা মোটা গোল থাম ; থামের পিছনে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির মুখটা দেখা যায়। চলন ঘরে একটি প্রশস্ত বেঞ্চিপাতা। সদরদ্বার বন্ধ। চলন ঘর অন্ধকার, কেবল সামান্য একটু আলো, দোতলা থেকে এসে পড়েছে।

মধ্যরাত্রি ; কেউ কোথাও নেই ; সব নিস্তব্ধ।

আলতো পায়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে কে যেন নেমে আসছে। পা দুখানি নগ্ন ; আস্তে আস্তে নামছে, দেখা গেল শাড়ির লাল পাড়, তার উপর ধূসর আলোয়ান। নেমে এল একটি স্ত্রীমূর্তি।

স্ত্রীমূর্তি চলন ঘরে এসে চুপ করে দাঁড়াল ; একবার মুখ তুলে দোতলার যেখান থেকে আলো এসে পড়েছে, সেই দিকে চেয়ে দেখল। তারপর মুখ নামিয়ে নিয়ে একটু একটু এক পা এক পা করে সদর দরজার কাছে গেল। সদর দরজার ভারী হুড়কাটি খোলবার জন্যে তার উপর হাত রাখতেই সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

ঠং করে ঘড়িতে একটা বাজল।

ঘড়ির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট যেন একটা ডাক। কে যেন নাম ধরে তাকে ডাকল। সেই ডাকটা অনুসরণ করে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে মাথাটা ঘুরে গেল। সেইক্ষণেই সেইখানে সে পড়ে গেল ; পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেই পতনের শব্দ শুনে কে যেন দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। চলন ঘরের আলোটি জ্বলে উঠল।

এসে দাঁড়াল একজন সুপুরুষ যুবক, ঋজু দীর্ঘ দেহ, মুণ্ডিত মস্তকে গৌর বর্ণ গোল মুখখানি বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। পরিধানে নূতন ধুতি, শুভ্র পাঞ্জাবী, শুভ্র আলোয়ান, পায়ে শুভ্র নূতন জুতা। বাবার শ্রাদ্ধের পর আজ নিয়ম ভঙ্গ ; বাপের ছোট ছেলের অঙ্গে সেই বেশ, নাম মহেশ।]

মহেশ। কে ?...কে ওখানে অমন করে শুয়ে ?

[কোন সাড়া নেই, মহেশ তার মাথার কাছে গিয়ে বসে পড়ল ; আস্তে আস্তে মাথাটি কোলে তুলে নিল ; একটু পরেই মেয়েটি চোখ চাইল]

মহেশ। তুমি!

উমা। তুমি!

মহেশ। ওঠ।…পারবে?

উমা। ধরলে। [মহেশ তাকে ধরে দাঁড় করাল]

মহেশ। পারছ না দাঁড়াতে?

উমা। না।

মহেশ। বস এইখানে। [বেঞ্চির উপর তাকে বসিয়ে দিল]

উমা। মাথাটা ঘুরছে।

মহেশ। আমি তোমায় ধরে বসছি।

[মহেশ উমার পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে রাখল]

উমা। এতক্ষণে দেখতে এলে?

মহেশ। কখন এসেছ?

উমা। খুব ভোরে।

মহেশ। সারাদিন?

উমা। এখানে।

মহেশ। কোথায়?

উমা। দেখতে পাওনি?

মহেশ। কৈ না।

উমা। কেউ তোমরা আমার খোঁজও নিলে না।

মহেশ। ওখানে অমন করে পড়েছিলে কেন?

উমা। চুপি চুপি এসেছিলুম, চুপি চুপি চলে যাচ্ছিলুম…যেতে যেতে…আর যাওয়া হল না…পড়ে গেলুম।

মহেশ। কেন এসেছিলে এমন চুপি চুপি?

উমা। কাজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ না হলে মানুষ চুপি চুপি আসে কেন?

মহেশ। কেন?

উমা। চুরি করতে।

মহেশ। কি চুরি করতে এসেছিলে এতদিন পরে?

উমা। "তুমি চুরি করি কেন এস চোর,
মরণ হে মোর মরণ।"

মহেশ। উড়ে যাওয়া খাঁচার পাখীটা কি আবার ফিরে এল ধরা দিতে?

উমা। ঐখানে যদি সত্যিই মরে পড়ে থাকতুম, তুমি কি কানের কাছে মুখটি রেখে করতে, একটিবার, আমার তর্পণ, এমনি করে?

মহেশ। ঠিক আগের মত কেবল ভুল বকেই যাচ্ছ?

উমা। ভুল নয় ঠিক; চুরি করতে এসেছিলুম তাও ঠিক! মরণ এল আরও চুপি চুপি আমাকেই চুরি করতে, তাও ঠিক। আমার চুরি করাও হ'ল না, মরণও হল না। এই, তোমার হাতে, হাতে হাতে ধরা পড়লুম।

মহেশ। [উমার হাতটি ধরে] ঠাণ্ডা বরফ! খেয়েছ কিছু?

উমা। না।

মহেশ। সারাদিনে?

উমা। কেউ ত খেতে ডাকেনি।

মহেশ। এখন আমি যদি ডাকি?

উমা। কেন ডাকবে, কেবল খাওয়াতে?

মহেশ। না খেয়ে কাজের বাড়ী থেকে যেতে নেই।

উমা। শুধু তাই;

মহেশ। আর কি?

উমা। আর কোন তাগিদে?

মহেশ। আর কি তুমি চাও?

উমা। এত রাতে সকলে শুয়ে পড়েছে, কে খাওয়াবে?

মহেশ। আমি জেগে আছি।

উমা। তুমি খেয়েছ?

মহেশ। আমি ত নিমন্ত্রণ খেতে আসিনি।

উমা। নিমন্ত্রণ ত আমাকেও কেউ করেনি।

মহেশ। তবে কেন এলে ?

উমা। তুমি খেলে কিনা খোঁজ নিতে।

মহেশ। খোঁজ নিয়েছ ?

উমা। দেখেছি।

মহেশ। কি দেখেছ ?

উমা। বাড়ীসুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তোমার চোখে ঘুম নেই।

মহেশ। আমার চোখের ঘুম কে কেড়ে নিয়েছে, জান না ?

উমা। তাই এই শীতের রাতে সারা বাড়ী এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

মহেশ। খুঁজছি ?

উমা। কাকে ?

মহেশ। আমার চোখের ঘুম যে কেড়ে নিয়েছে।

উমা। তুমি নিজেই যে এমনি এক শীতের রাতে তোমার চোখের ঘুমকে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

মহেশ। আমার চোখের ঘুম যখন গেল, তোমার কি থাকল ?

উমা। কান্না।

মহেশ। শুধু কান্না ?

উমা। তোমার চোখের ঘুম, আমার চোখের নেশা সবশেষ করে দিয়ে সেদিন আদালত থেকে যখন ফিরে এলুম, তখন মনকে প্রশ্ন করলুম—এবার কি তোর বাকী রইল ? মন বললে, কান্না। সত্যি অন্ধকার ঘরে বিছানায় আছড়ে পড়ে সেদিন যে কেঁদেছি কত কান্না ! কান্না কি থামতে চায় !

মহেশ। কেউ এল' না কান্না থামাতে ?

উমা। মা একবার এসে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ; হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল !

মহেশ। স্বপ্ন দেখে ?

উমা। স্বপ্ন নয় সত্যি দেখেছি আমার জলভরা দুই চোখের সামনে তিনি এসে দাঁড়ালেন, সেই আদরের ডাক, অনেক দিন যা শুনতে পাইনি,…"উমা, মা আমার ফিরে এস"…ধড়মড় করে উঠে তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়তে গেলুম ; মাথা ঠুকে গেল, তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। হন্যে হয়ে সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। মা বললেন, কাকে খুঁজছিস্? আমি বললুম আমার শ্বশুর এসেছেন, আমাকে নিয়ে যেতে মা ; আমি যাব। মা বললেন, কৈ তাঁকে ত দেখিনি,…আমি বললুম, দেখনি কি, আমি যে চোখের সামনে দেখলুম, আমি যে নিজের কানে শুনলুম সেই আদরের ডাক, আমার ত ভুল হবার কথা নয় মা! আবার আমি খুঁজতে লাগলুম। মা টেলিফোন করলেন তোমাদের বাড়ীতে, তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বসলেন, তখন তাঁরও চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে ; মা আমার মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, তোর শ্বশুর এইমাত্র মারা গেছেন।

[উমা মহেশের বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগল ; মহেশের চোখেও জল। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।]

মহেশ। যখন সব শেষ হয়ে আসছে তখনও তাঁর মুখে তোমার নাম। উমা মা'কে ফিরিয়ে আন।

উমা। অত আদর আমার নিজের বাবা মার কাছে পাইনি।

মহেশ। বিয়ের পর তোমাকে পেয়ে বাবার কি আনন্দ!

উমা। সব সময় দেখতুম।

মহেশ। সবাইকে তিনি বলে বেড়াতেন আমি পারস্যের গোলাপ ঘরে এনেছি।

উমা। আমি বাড়ীসুদ্ধ সকলের ভালবাসা পেয়েছিলুম।

মহেশ। তোমাকে খুশী করতে সকলেই ব্যগ্র ; তোমার সঙ্গে একটু শুধু কথা বলতে সকলেই তোমায় খুঁজে বেড়াত।

উমা। আমাকে খুশী করতে বাবা মা তাঁদের অনেক দিনের বিলাতের বাসা তুলে দিয়ে দেশে ফিরে এসে স্থায়ী বাসা বাঁধলেন,

আমার জন্যে একটি ভাল পাত্র খুঁজতে। মায়ের পছন্দ আছে তিনি তোমাকে খুঁজে বের করলেন।

মহেশ। আমার চোখ দুটোকে শুধু একটা বিদ্যুৎতের চমকে ধাঁধিয়ে দিয়ে চলে গেলে, ফেলে গেলে অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝাপটা।

উমা। তোমাকে পেয়ে আমি বিলাতের বেপরোয়া জীবন ভুলে গেলুম।

মহেশ। তবে সন্ধ্যে হলেই অমন বায়না শুরু করতে কেন?

উমা। মায়ের পায়ে হাত দিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলুম, কিছুই আর তখন মনে থাকত না। তুমি যদি একটু শক্ত হ'তে।

মহেশ। পারিনি, তোমার ছটফটানিতে।

উমা। তোমার কথা শুনে রোজ সন্ধ্যের পর বাড়ী গিয়ে একটু করে খেয়ে আসতেও রাজী হলুম না, ধরা পড়বার ভয়ে।

মহেশ। হোটেলে খেতে গিয়ে সেই ধরা পড়লে, আর আমাকে লজ্জায় ফেললে।

উমা। তুমি ছিলে যেমন লাজুক তেমনি ভীতু; তুমি যদি হাল না ছেড়ে দিতে, অভিভাবকহীন একা আমি ক্লাবে গিয়ে অমন বেপ-রোয়া হয়ে উঠতে পারতুম না।

মহেশ। প্রতি রাত, ক্লাব থেকে ফিরতে কত যে রাত হত তার হিসেবও রাখতে না। দেখে শুনে বাড়ীর সবাই রাগে ফেটে পড়ল।

উমা। তখন কি আর আমি আমাতে থাকতুম!

মহেশ। শেষে সেই কালরাত্রির কথা!

মা। আমার কিছুই মনে নেই।

মহেশ। তুমি ফিরলে রাত তখন দুটো। বাড়ীসুদ্ধ সকলে ঘুমিয়ে, শুধু জেগে আছি একলা আমি জানালায় দাঁড়িয়ে, কখন তুমি ফিরবে। তুমি ফিরতেই চুপচাপ ফটক খুলে দিয়ে তোমাকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলুম; আর তোমার মুখে হাত চাপা দিয়ে চেঁচাতে না করছিলুম।

উমা। তুমি সামলাতে পারছিলে না?

মহেশ। তুমি উন্মাদ হয়ে নাচতে শুরু করে দিলে, অর্ধেকটা শাড়ি গায়ে, অর্ধেকটা লুটোচ্ছে, আর চিৎকার করে অশ্লীল কবিতা আওড়াতে শুরু করলে।

উমা। ছিঃ ছিঃ সবাই শুনলে ?

মহেশ। সবাই ছিঃ ছিঃ করে কানে আঙ্গুল দিয়ে চিৎকার করে উঠল।

উমা। আমি তখন এক স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিলুম।

মহেশ। নেশায় মানুষ স্বপ্ন দেখে ? কি স্বপ্ন দেখছিলে ?

উমা। স্বপ্ন দেখছিলুম সমুদ্রতীরে তুমি আর আমি একলা বেড়াচ্ছি। পূর্ণিমার রাত সমুদ্রের ঢেউ উদ্দবেল হয়ে উঠেছে আর তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জ্যোৎস্না সব আলোটুকু নিয়ে সমুদ্রকে চুমু খাচ্ছে। সেই দৃশ্য তোমাকে আমি দেখাচ্ছি আর তোমাকে কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে চুপি চুপি একটা মিষ্টি কবিতা শোনাচ্ছি।

মহেশ। কি মিষ্টি কবিতা আজ আবার একটিবার শোনাও না ?

উমা। সে সুর যে হারিয়ে গেছে, সে তার যে ছিঁড়ে গেছে।

মহেশ। তার স্মৃতিটা ?

উমা। জিভের ডগায় এখনও একটা মিষ্টি স্বাদের মত লেগে আছে।

মহেশ। সেই মিষ্টি স্বাদটুকু…

উমা। আবার কি চাখ্‌তে চাও আমার মুখে ?

মহেশ। এই নিরিবিলিতে……

উমা। কি ? …কি চাও এই নিরিবিলিতে আমার কাছে ?

মহেশ। …কবিতাটা শুধু, আর কিছু নয়।

উমা। তবু মনটা খুলতে পারছ'না ? শোন চুপিচুপি কানটা নামিয়ে—

And the sunlight clasps the earth,
And the moon beams kiss the sea
what are all these kissings worth
If thou kiss not me ?

…কি কানে আঙ্গুল দেবার মত অশ্লীল ?

মহেশ। না।

উমা। তবে ?

মহেশ। মদনের বাণ।

উমা। সেদিন তবে কেন এই কবিতা শুনেই মদনকে ভস্ম করে দিলে ?

মহেশ। তখন বাড়ীসুদ্ধ সকলে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। এক দিকে তাঁদের ধিক্কার আর একদিকে তোমাকে নিয়ে আমি পাগল।

উমা। লজ্জায় ভয়ে তোমার মুখখানি কি সুন্দর দেখাচ্ছিল !

মহেশ। তাঁদের চিৎকার আর তিরস্কার থেকে তোমাকে একটু আড়াল করতে, ফটক খুলে তোমাকে ঠেলে দিয়েছিলুম রাস্তায়।

উমা। তখন আমার নেশা কেটে গেছল ; বুঝতে পেরেছিলুম কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে।

মহেশ। ভেবেছিলুম তুমি রাস্তায় কোথাও গিয়ে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। বাড়ীর সকলে শুয়ে পড়লে আবার আমি তোমাকে গিয়ে নিয়ে আসব। তারপর আমি রাস্তায় বেরিয়ে এদিক ওদিক কত খুঁজলুম, আমি একা নয় বাড়ীর আরও অনেকে ; তোমায় কোথাও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সেইদিন থেকে তুমি আমার কাছে হারিয়ে গেলে। কোথায় তুমি চলে গেলে ?

উমা। যেমন যে অবস্থায় তুমি আমায় রাস্তায় বের করে দিলে সেই অবস্থায় আমি ছুটতে ছুটতে সব পথটা হেঁটে যখন আমাদের বাড়ীতে পৌঁছলুম, তখন ভোর হয়ে গেছে। বাবা বেড়াতে বের হচ্ছেন।

মহেশ। বাবা কি বললেন ?

উমা। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বইয়েই পড়েছি; কখনও ত দেখিনি, সেদিন দেখলুম।

মহেশ। মা

উমা। মা আমার হিমগিরির তুষারশৃঙ্গ, তাঁর ধ্যান কিছুতেই ভাঙ্গে না।

মহেশ। আমার প্রতি তাঁর অত স্নেহ!

উমা। তাও ভাঙ্গেনি।

মহেশ। কিসে জানলে?

উমা। মা একদিন বলেছিলেন, "সীতাকেও ত রামচন্দ্র ত্যাগ করেছিলেন,"...মার মুখের কথা মুখেই থাকল, বাবা চিৎকার করে বলে উঠলেন "তিনি ভদ্রতা করে নিজের ঘরের রথে করে ছোট ভাইকে সঙ্গে দিয়ে ঘরের বউকে বনে পাঠিয়েছিলেন।" [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] মায়ের কোন কথা রইল না, মামলা হল।

মহেশ। তুমি!

উমা। মার মত আমিও মুখে চাবি দিলুম; সত্য যখন নীরব, মিথ্যা তখন মুখর হয়ে উঠল।

মহেশ। আমাদের বাড়ীতে চাবুক তুমি কোথায় আবিষ্কার করলে?

উমা। বাবা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, আর নয়, এ দেশের পাঠ উঠিয়ে আবার তিনি বিলেতে গিয়ে পাকা বাসা বাঁধবেন: তাই যত শীঘ্র হোক আমার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতেই হবে। মার দিকে চাইলুম; মার ধ্যানস্থ মন আরও অন্তর্মুখী হয়ে গেল। মার স্নেহের অন্দর মহলে প্রবেশ করতে না পেরে বাবার সদরে এসে ধিঙ্গীপনা শুরু করে দিলুম। আর সেখানে মিথ্যার অভিনয় করতে গিয়ে এক একবার মন যখন, না, না, না করে কেঁদে উঠত তখন মদের মাত্রা বাড়িযে দিয়ে তাকে নিঃসাড় করে ফেলতুম। এমনি ধারায় চললে হয়ত একদিন মায়ের রক্তেগড়া আমার মনটাকে মেরেই ফেলতে পারতুম, যদি না শ্মশানে যাবার পথে তিনি আমাকে অমন আদরের ডাক দিয়ে যেতেন।

মহেশ। বাবার ডাকে তুমি সাড়া দিয়েছিলে?

উমা। না যদি দিতুম, বাবার বিলাতি ব্যাঙ্কে জমান অত টাকা, যার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আমি, তার আকর্ষণ কাটাতে পারতুম কি করে?

মহেশ। আশ্চর্য !

উমা। কি ?

মহেশ। এমনি আচমকা আবার তোমার দেখা পাওয়া।

উমা। সেইদিন থেকে তোমাকে আর একটিবার দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। শুনলুম খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধের আয়োজন করছ। তুমিই হয়ত আসবে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে। কত ভেবে রেখেছিলুম তুমি এলে তোমাকে আমার ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে প্রাণখুলে একবার কেঁদে নেব।···তা আর হল না, তুমি এলে না।

মহেশ। তোমাদের নিমন্ত্রণ করবার কথা ওঠেনি।

উমা। যেদিন বুঝলুম আর তুমি আসবে না, সারারাত শুয়ে শুয়ে তোমার জন্যে কাঁদলুম ; সারারাত ঘুম হল না ; ভোর না হতেই আমার গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

মহেশ। কোথা ?

উমা। তোমাদের বাড়ীর দিকে।

মহেশ। আচ্ছা।

উমা। মতলব ছিল গাড়ীটা তোমাদের বাড়ীব সামনে রেখে ভিতরে চুপ করে বসে থাকব ; তুমি একবাব জানলায় এসে দাঁড়ালে দেখতে পাব।

মহেশ। কবে ?

উমা। গাড়ী চালাতে চালাতে বুঝতে পারলুম, ধরা পড়লে একটা কেলেঙ্কারি হবে। কি করি, কি করি ভাবছি, আর খুব শ্লো স্পীডে গাড়ী চালাচ্ছি ; লক্ষ্য করিনি কতকগুলি ছোকরা গাড়ীর পাশে পাশে হাঁটছে আর আমাকে দেখছে।

মহেশ। তোমাকে দেখলে কে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

উমা। সেই ছোকরাগুলোর মধ্যে চোখে পড়ল একটা চেনা মুখ। টপ করে গাড়ী থামিয়ে তাকে গাড়ীতে তুলে নিলুম, আমি জানতাম সে ভাল গাড়ী চালায়।

মহেশ। তোমাদের কাছে কাজ করত ?

উমা। স্টেটবাসে ; কি কারণে চাকরি যায়। পাড়ায় থাকত ; আর আমি জানালায় এসে দাঁড়ালে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে সামনের রকে বসে থাকত।

মহেশ। তুমি ?

উমা। একদিন বাবার কাছে ধরা পড়ে বেদম প্রহার খেল। তারপর আর কখন তাকে দেখতে পাইনি। সেদিন দেখলুম গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে।

মহেশ। পেছু নিয়েছিল ?

উমা। গাড়ীটা একটু জোরে চালিয়ে একটু ফাঁকায় এসে আমি নেমে পিছনের সীটে বসলুম, তাকে গাড়ী চালাতে বললুম, বললুম যেখানে নিয়ে যেতে বলব যাবে, যেখানে থামতে বলব' থামবে।

মহেশ। তারপর ?

উমা। তোমাদের বাড়ী।

মহেশ। তারপর ?

উমা। কে একজন, আগে কখন দেখিনি, এসে জানাল আজ অশৌচান্ত, সকলে ঘাটে গেছেন, কোন ঘাট, বলে দিলেন।

মহেশ। তারপর ?

উমা। গেলুম ঘাটে।

মহেশ। তারপর ?

উমা। বলছি…[একটুখানি হেসে] মুণ্ডিত মস্তকে তুমি যখন গঙ্গা থেকে উঠে এলে, তোমায় দেখে মনে হল যেন স্বয়ং মহাপ্রভু আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

মহেশ। কি চশমা তখন তোমার চোখে ছিল ?

উমা। তোমারি দেওয়া চশমায় তোমাকেই চেনা যায় !

মহেশ। সেটা কি ?

উমা। তুমি ন্যাকা !

মহেশ। তারপর?

উমা। তোমরা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ গাড়িতে বসে বসে কাঁদলুম।

মহেশ। ছেলেটি?

উমা। জিজ্ঞেস করলে, ফিরব? আমি বললুম, আমি গঙ্গায় নেয়ে আসি, আমার আজ অশৌচান্ত, বলেই টপ্ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে যেমন ছিলুম গঙ্গায় ডুব দিতে গেলুম; ছেলেটিও পেছু পেছু আসতে লাগল।

মহেশ। তুমি ছিলে বাবার সব চেয়ে আদরের!

উমা। জীবনে কখনও গঙ্গাস্নান করিনি; ঘাট আঘাট চিনি না। তখন জোয়ার এসে গেছে, জলে ভীষণ টান, আঘাটায় নামতে গিয়ে পা পিছলে গেল, পড়ে গেলুম, জোয়ারের টানে ভেসে গেলুম।

মহেশ। কে বাঁচালে?

উমা। সেই ছেলেটি, অচৈতন্য অবস্থায় জল থেকে।

মহেশ। তারপর!

উমা। ছেলেটির সমস্যা অনুমান কর। যদি সেই অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যায়, বাবার হাতে তার রক্ষা নেই; যদি হাসপাতালে নিয়ে যায় কি পরিচয় দেবে?

মহেশ। করলে কি?

উমা। আমাকে অচৈতন্য অবস্থায় গাড়ীতে শুইয়ে দিয়ে নিয়ে গেল তার মামার কাছে তারকেশ্বরে।

মহেশ। মামা ডাক্তার?

উমা। মামা তারকেশ্বরের পুরোহিত; মামার কাছে শুনেছিল বাবার কাছে হত্যা দিলে মরা মানুষকেও বাঁচান যায়।

মহেশ। কলকাতা থেকে তারকেশ্বর, গাড়ী করে অচৈতন্য অবস্থায় তোমায় নিয়ে!

উমা। মরিনি ছেলেটির বিশ্বাসের জোরে।

মহেশ। কখন জ্ঞান হল?

উমা। মামা এসব দেখে ত রেগে খুন, কিন্তু করেন কি? শেষে বললেন, ওকে নাটমন্দিরে শুয়ে ফিরে যা, ওর বাবা-মাকে নিয়ে আয়। তারপর হত্যা দেবার কথা হবে।

মহেশ। তখনও তোমার জ্ঞান হয়নি?

উমা। কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরল,' সব শুনলুম মামার মুখে; ছেলেটিকে সমর্থন করেই বললুল, হাঁ আমি হত্যা দিতেই এসেছি, আপনি ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, শেষে বললেন, তুমি কি প্রত্যাদেশ পেয়েছ মা?

মহেশ। প্রত্যাদেশ কি?

উমা। তখন জানতুম না; তবে মন সায় দিল।

মহেশ। হত্যা দেওয়া কি জানতে?

উমা। তা ও জানতুম না; শুধু এইটুকু বুঝলুম, বাবার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, কোন সংশয় না রেখে।

মহেশ। বাবা মাকে আনতে গেছল?

উমা। বাবা এলেন না, মা এলেন কিন্তু তাঁর আসবার আগেই আমি হত্যা দিয়ে পড়েছি।

মহেশ। মার সঙ্গে কোন কথা হ'ল না?

উমা। তিন দিন তিন রাত পরে উঠে এসে মাকে সব বললুম, আমি প্রত্যাদেশ পেয়েছি।

মহেশ। কদিন মা ছিলেন?

উমা। কেবল বাবার চরণামৃত খেয়ে আর কখন গীতা কখন চণ্ডী থেকে পাঠ করে। নাটমন্দিরে ঘোরের মধ্যে শুনতে পেতুম মায়ের পাঠ।

মহেশ। ছেলেটি?

উমা। কদিন সমানে আমাদের দুজনকে পাহারা দিলে, কি খেলে কোথায় শুলো কেউ তার খোঁজ নিলে না।

মহেশ। সেই আবার গাড়ী চালিয়ে ফিরিয়ে আনলে?

উমা। হাঁ; মা আজ ভোর হবার আগেই আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

মহেশ। ছেলেটি ?

উমা। অনুমান করছি মাকে নিয়ে ছেলেটি যখন আমাদের কম্পাউণ্ডে ঢুকলো, বাবা তাকে গাড়ী থেকে টেনে নামিয়ে বেধড়ক প্রহার দিলেন।

মহেশ। বল কি ? এত কষ্টের পর মরে যাবে যে !

উমা। ওর কিছু হবে না; প্রহ্লাদ চরিত্র আজও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়।

মহেশ। ছেলেটি কি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ?

উমা। ও এক রকম আমরা সবাই। এই আমাদের পরিবারটিকে দেখনা; বিলাতে থাকতে বাবা যখন মদে চুর হয়ে বসে থাকতেন মা তখন তন্ময় হয়ে মহাভারত পড়তেন; আমাকে কাছে বসিয়ে কালিদাস পড়ে শোনাতেন। আমি বাবার কাছে বাবার মত মার কাছে মার মত মানুষ হতে লাগলুম। তাই বিরোধ রয়ে গেল আমার চরিত্রে, কেউ আমায় চিনলে না।

মহেশ। আমাকেও না।

উমা। তুমি চিরকাল আদরে মানুষ, তোমার জীবনে আর বিরোধ কোথা ?

মহেশ। চিরকাল আদরে মানুষ হয়েছি, তুমি দেখেছ ?

উমা। দেখেছি বলেই ত বললুম।

মহেশ। কবে দেখলে ?

উমা। আজও ত দেখলুম।

মহেশ। আজই, কখন কোথায় ?

উমা। তোমার বৌদিদিরা আজ রাত্রে আপন আপন বাসর শয্যার বেশভূষা করে যখন শুতে গেলেন, একে একে তোমাকে আদর জানিয়ে গেলেন। তাঁদের খোঁপায় জড়ানো বেল ফুলের মালা তোমার গালে ছুঁইয়ে দিয়ে তোমার মনটাকে উন্মনা করে দিয়ে গেলেন না ?

মহেশ। কোথা থেকে এসব তুমি দেখলে ?

উমা। তোমার ঘরে লুকিয়ে বসে খড়খড়ি তুলে উঁকি মেরে।

মহেশ। কখন গেলে ও ঘরে ?

উমা। আজ সারাদিনই ত ও ঘরে ছিলুম।

মহেশ। সারাদিন একলা ?

উমা। কেউ ত খোঁজ নেয়নি।

মহেশ। একলা সারাদিন কি করলে ও ঘরে ?

উমা। অর্চনা।

মহেশ। কার ?

উমা। মীনকেতু মদনের।

মহেশ। মানে ?

উমা। ভেবেছিলুম আজ নিয়মভঙ্গ পালন করতে ও ঘরে তুমি শুতে যাবেই। ভেবেছিলুম ও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পধনু তোমার বক্ষে বিঁধবেই, তাই আমি লু কয়ে বসে অপেক্ষা করছিলুম, যখনই তুমি মদনের বাণে আহত হবে ঠিক তখনই আমি...

মহেশ। বল, বল তখনই তুমি কি করতে ?

উমা। কিছুই ত আর করা হল না; কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চলে যাচ্ছিলুম।

মহেশ। কেন কেউ কিছু তোমায় বলেছে না কি ?

উমা। না আর কেউ নয়, বলেছে আমার মন। তোমার ঘরে একটা কেলেণ্ডার টাঙ্গানো আছে, কেলেণ্ডারের তারিখ আমায় মনে করিয়ে দিলে আজ আমার মামলার রায় দেবার দিন। হয়ত রায় দেওয়া হয়ে গেছে, হয়ত সেই রায় তোমরা শুনেছ ; আর সেই রায় শুনে বাড়ীসুদ্ধ স .স আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ।

মহেশ। কিসের রায় ?

উমা। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদের। জান না আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করেছি ?

মহেশ। শুনেছি।

উমা। কেন এই মিথ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াওনি? কেন মামলা এক তরফা হতে দিলে?

মহেশ। বাড়ীর সকলের যা ইচ্ছা।

উমা। বাড়ীর সকলের ইচ্ছাপূর্ণ করে তাই এই অর্দ্ধেক রাত্রে নিমন্ত্রণ বাড়ী থেকে অনাদৃত, অনাহূত অভুক্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছিলুম।

[কাঠের সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ির বড আলো জ্বলে উঠল। নেপথ্য থেকে ভারী গলার সুর—"কে? কে ওখানে এখনও!"]

মহেশ। [উমাকে ছেড়ে দিয়ে ত্রস্তে উঠে দাঁড়িয়ে] সর্ব্বনাশ, দাদা উঠে পড়েছেন? [নিজের হাতে সদরের হুড়কো খুলতে গিয়ে] যাও, যাও চুপি চুপি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

উমা। তারপর?

মহেশ। দাদা চলে গেলে আবার তোমাকে ভেতরে ডেকে নেব

উমা। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি; আর আমি তা হতে দেব না।

মহেশ। হাতে হাতে ধরা পড়বে?

উমা। পালাবার জাতের চোর আমি নই; আমি যাব না।

[সদর দরজার ওপর পিঠ দিয়ে দাঁড়াল]

মহেশ। তবে তুমি একাই ধরা পড়; আমি নেই।

উমা। [মহেশের হাত চেপে ধরে] না, তুমি যাবে না। [ঠিক এই অবস্থায় সুরেশের প্রবেশ]।

সুরেশ। মহেশ, তুমি এখনও এখানে কি করছ? ...কে ও?

[মহেশ দাদাকে দেখেই নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাদার সামনে গেল।]

মহেশ। ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিল, ফটক বন্ধ করতে পারলুম না।

সুরেশ। ফটক ত' বন্ধ দেখছি।

মহেশ। অনেক রাত হয়ে গেছে, তাই আজকের রাতের জন্যে আশ্রয় চায়।

সুরেশ। আশ্রয়! বাবার রাজপ্রাসাদের লৌহকপাট কি বন্ধ হয়ে গেছে ওর কাছে?

মহেশ। কে খবর দেয় এত রাত্রে?

সুরেশ। আমি দিচ্ছি; এখনই ফোন করে দিচ্ছি, এসে নিয়ে যাক।

মহেশ। ঠাণ্ডার রাত।

সুরেশ। মরে যাবে?

মহেশ। কষ্ট হবে।

সুরেশ। কষ্ট! কষ্ট দেখনি বাবার মরবার সময়? মরছেন, তবু মরতে মরতে,—"উমা, মা আমার ফিরে এস'।"

[গলার স্বর আটকে গেল]

উমা। সেই ডাক শুনেই আমি এসেছি।

সুরেশ। হত্যা করে নিজের কীর্তি দেখতে?

মহেশ। আমাদের গাড়ী করে?

সুরেশ। ড্রাইভার দুজনে সারাদিন আজ খেটেছে; এখন ঘুমোচ্ছে।

মহেশ। আমিই না হয়

সুরেশ। তুমি যাবে!

মহেশ। যাব আর আসব।

সুরেশ। নিঃসম্পর্কীয়া একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে এই নিশুতি রাতে একা মটর ভ্রমণে যাবে তোমার বাপের শ্রাদ্ধের এই পবিত্র দিনে?

মহেশ। তবে থাক।

সুরেশ। থাক কি?

মহেশ। থাক আজ ও।

সুরেশ। মানে?

মহেশ। আজ রাতটা।

সুরেশ। আজ মামলার রায় দেবার কথা ; জান কি রায় হয়েছে ? খোঁজ রাখ ?

মহেশ। না।

সুরেশ। কি বায় হতে পাবে ?

মহেশ। জানি না।

সুরেশ। মামলা এক তরফা হয়েছে তাও জান না ?

মহেশ। তা জানি।

সুরেশ। তা হলে কি হতে পারে ?

মহেশ। ওর পক্ষে ডিগ্রী।

সুরেশ। তাবপর ?

মহেশ। কোর্টেব বায় মানতে হবে।

সুরেশ। কখন থেকে ?

মহেশ। রায়ের সঙ্গে সঙ্গে।

সুরেশ। আজই যদি সেই রায হয়ে থাকে ?

মহেশ। জানি না।

সুরেশ। কি জান না ?

মহেশ। আজ রায় দিয়েছে কিনা।

সুরেশ। যিনি এত ধুমধাম করে মামলা কবেছেন তিনিও কি জানেন না ?

মহেশ। সারাদিন ও আজ এখানে।

সুবেশ। এখানে কেন ?

মহেশ। ভুল করে মনে করেছিল ওঁদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, তাই এসেছিল। অনেক রাত অবধি কেউ খেতে ডাকলে না, তাই চলে যাচ্ছে।

সুবেশ। কাজের বাড়ীতে এসেছে ; সম্পর্ক থাক না থাক, কেউ খেতে ডাকবে না কেন ! বাবা মরতে না মরতে বাড়ীতে এই সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটতে শুরু করেছে ! ডাক তোমার বৌদিদিকে।

মহেশ। বৌদিদি ঘুমোচ্ছে।

সুরেশ। [গলার স্বর উঁচু করে] না, জেগে আছে। ঘুমোবার জো আছে! সেই থেকে ফিস্‌ফিস্ চ'লছে। কে কথা বলছে। কে এখনও জেগে আছে? এই নিয়ে দুজনের তর্ক, ঘুম কোথা!

[বৌদিদি সরমার প্রবেশ]

সরমা। কি চেঁচামেচি শুরু করে দিলে মাঝরাত্রে? ওমা! এ দুটী যে এখানে!

সুরেশ। কেন চেঁচামেচি বুঝলে?

সরমা। আমি ওদের বুঝছি; তুমি শুয়ে পড়গে।

সুরেশ। ঘুম আমার চড়ে গেছে।

সরমা। না, না, ঘুম তোমার এখন চড়ালে চলবে না; এখন তুমি অগাধে ঘুমোচ্ছ; টেলিফোনে এই মাত্র বলেই আমি ছুটে খবর দিতে এলুম।

সুরেশ। কার টেলিফোন?

সরমা। মাঝ রাতে কে টেলিফোন করে ডাক্তারের বাড়ীতে?

সুরেশ। কি বললে?

সরমা। এখনই আসতে হবে, রোগী মরছে।

সুরেশ। কি নাম বললে?

সরমা। আমি বলে দিয়েছি, আজ যেতে পারবে না।

সুরেশ। এ তোমার অন্যায় বলা।

সরমা। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, আমি বলে দিয়েছি।

সুরেশ। আমাকে একবার ডাকলে ত হোত; বুঝতুম সিরিয়াস্ কিনা?

সরমা। বললুম, কাজের বাড়ী ঝামেলা মিটিয়ে এই সবে শুয়েছেন; চোখটা লেগে এসেছে; ডাকতে পারব না।

সুরেশ। তা'তে কি বললেন?

সরমা। বললেন, তবে আমিই যাচ্ছি, বলে রিসিভারটি রেখে দিলেন।

সুরেশ। নামটা জেনে নিতে পারতে।

সরমা। আমি নাম জিজ্ঞেস করিনি; যাবে না যেতে পারবে না; সোজা বলে দিয়েছি।

সুরেশ। বড্ড বাড়াবাড়ি বললে?

সরমা। মরছে বললে।

সুরেশ। তাই ত!

সরমা। তাই ত! কি করতে হবে? এই হিমে মাঝরাত্রে রোগী দেখতে গিয়ে, বাড়ীতে একটা শ্রাদ্ধ মিটিয়েছ, আবার একটার যোগাড় করতে হবে?

মহেশ। আঃ বৌদি, কি যাতা বকছ?

সরমা। তুমিই বা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি শুনছ? যাও দাদাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে কচি ছেলের মত ঘুম পাড়িয়ে এস। আমি এই ফটক আগলে দাঁড়িয়ে রইলুম। স্বয়ং লাট সাহেব এলেও তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে ফটক বন্ধ করে তবে উঠব।...যাও।

সুরেশ। তাই ত!

সরমা। আবার তাইত তাইত করে? [ধমকাইয়া]

মহেশ। আচ্ছা দাদা চল না। বৌদি ত ঠিক কথাই বলছে। ক'দিন ধরে কি ধকল যাচ্ছে তোমার শরীরে! ডাক্তার বলে কি তোমার শরীরটা শরীর নয়? চল শোবে চল।

সরমা। ভাল মুখে নয়, হাত ধরে টেনে নিয়ে যাও।

সুরেশ। ধমক খেলে প্রাণটা বের হয় না?

মহেশ। আজকের রাতটা তোমার বিশ্রাম করা সত্যি দরকার।

সুরেশ। চল যাচ্ছি।

[মহেশের কাঁধে হাত রেখে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে উমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কি যেন বলতে গেলে, তাঁকে থামিয়ে...।]

সরমা। ওকে আমি দেখছি। ওর জন্যে আর মাথা বকিও না, তুমি শুতে যাও।

[ফিরে যেতে সরমা আবার পেছু ডাকল।]

সরমা। দেখ মহেশ, দাদাকে শুইয়ে তুমি টেলিফোনের কাছে বসে থাকবে, আমি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত। কোন টেলিফোন এলে একেবারে সাফ বলে দেবে, শহরে ঐ একটা হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া আরও অনেক ভাল ডাক্তার আছে। দেখ খবরদার ওঁকে টেলিফোন ছুঁতে দেবে না।

সুরেশ। গার্জ্জেন!

সরমা। হ্যাঁ তাই। [সুরেশ ও মহেশ চলে গেলেন।]

সরমা। [উমাকে] বল কি তোর মতলব?

[উমা নিরুত্তর।]

সরমা। কখন এসেছিস?

উমা। ভোরে।

সরমা। দেখতে পেলুম না?

উমা। তুমি তখন ঠাকুর দালানে।

সরমা। সারাদিন কোথায় ছিলি?

উমা। নিজের ঘরে।

সরমা। নিজের ঘর! কোন মুখে বলিস?

উমা। আমার রায় কি শুনেছ?

সরমা কিসের রায়? তোর ফাঁসির?

উমা। ফাঁসি হলে ত বেঁচে যেতুম।

সরমা। ফাসিই তোর হওয়া উচিত, বাবাকে তুই খুন করেছিস।

[কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই]

সরমা। তোর জন্যে শুধু এইটুকু দুঃখ হয়, অমন বাবাকে তুই চিনতে পারলিনি।

[কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল]

সরমা। তুই আমাদের সকলের কত আদরের ছিলি,...সেই তুই কোর্টে গেলি আমাদের পর করে দেবার জন্যে!...শুনে আমি কান্না চাপতে পারিনি।

উমা। দিদি, আমার রজো-গুণ মহিষাসুর হয়ে আমাকে এই স্বর্গরাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলে।

সরমা। খবরদার, থিয়েটারী ঢং-এ কথা বলিসনি, গা জ্বলে যায় ঐ সব কথা শুনলে।

উমা। তোমাদের কাঁদাতেই আমি এসেছিলুম।

সরমা। ঐ মহেশ, আমার যখন বিয়ে হয় ওর বয়েস মোটে পাঁচ। আমাকে দেখছে, আর ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে গিয়ে ধরে আনতে আমার আঁচলের ভেতর লুকোলো। সেই-দিন থেকে এই আচল চাপা দিয়ে ওকে এত বড় করলুম ; ওর বিয়ে দিলুম। আর আজ এই লক্ষ্মণের দিনে আমরা সব জায়েরা যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম ; আর ও হ্যাংলার মত একা একা হিমের রাতে বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। বল, এতে আমার ঘুম হয়, না চোখের জল রোখা যায়! [চোখ মুছল।]

উমা। তুমি বলে দাও আমায় কি করতে হবে ?

সরমা। তুই যদি আমার মায়ের পেটের বোন হতিস গলা টিপে তোকে মেরে ফেলতুম। রাক্ষুসী তুই আমার কে যে, তোকে কি করতে হবে বলতে যাব ?

[সরমার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল'। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা সরল না।]

উমা। দিদি, মানুষ মরলে কোথায় যায় ?

সরমা। স্বর্গে।

উমা। বাবা ত স্বর্গে যান নি ?

সরমা। কেন, তোর মত পাপিষ্ঠাকে ঘরে এনেছিলেন বলে ?

উমা। আমি যে তাঁকে দেখলাম।

সরমা। কোথায় ?

উমা। তারকেশ্বরে।

সরমা। গেছলি সেখানে ?...কবে ?...কেন ?

উমা। তিনিই আমাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গেছলেন।

সরমা। আবার হেঁয়ালি করে কথা বলে!

উমা। অশৌচান্তের দিন তোমরা ঘাট থেকে যখন ফিরে গেলে আমি গঙ্গায় নামলুম।

সরমা। মা পাঠিয়েছিলেন?

উমা। বাড়ীতে কেউ জানে না কে যে আমাকে সেদিন টেনে নিয়ে গেল গঙ্গা নাওয়াতে!

সরমা। কদিন নিয়ম পালন করেছিলি?

উমা। পারিনি; ভ্রষ্টাচারে নাইতে নেমে জোয়ারের টানে ভেসে গেলুম; ডুবেই যাচ্ছিলুম।

সরমা। বাঁচলি কি করে?

উমা। কি করে কি হল দিদি সে অনেক কথা; যদি কখনও দিন পাই, সব তোমাকে বলব।..যখন জ্ঞান হল চেয়ে দেখি একটা পাথরের মেঝের ওপর ভিজে কাপড়ে পড়ে আছি।

সরমা। কোথায়?

উমা। যেখানে তোমরা আমাদের বিয়ের পর জোড়ে দাঁড়াতে নিয়ে গেছলে।

সরমা। বাবার স্থানে।

উমা। তিন দিন তিন রাত বাবার স্থানে হত্যে দিয়ে পড়ে রইলুম, মাত্র বাবার চরণামৃত খেয়ে।

সরমা। বলিস কি?

উমা। বাবার পুরোহিত বলে দিয়েছিলেন হত্যা দেবার সময় কেবল মনে মনে বাবাকে ধ্যান করতে, আর কোন রকম ভয় কোন রকম চিন্তা না করতে। তাই করতুম, ধ্যান করতে করতে যখনই দেখতুম বাবা তারকনাথকে, তখনই দেখতুম বাবা তারকনাথের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন...

[কান্নায় উমার কথা আটকে গেল]

সরমা। বল বল কাকে দেখতিস?

উমা। আমাদের বাবাকে।...তিনিই আমাকে আগলে রেখে-ছিলেন, তা নাহ'লে কি পারতুম !

সরমা। যাবার সময় আমার হাত দুটো ধরে বলে গেলেন, তুমি সবার বড়, তোমার হাতে সকলকে রেখে গেলুম। তারপর বলতে বলতে গলা আটকে যাচ্ছিল, বড় কষ্ট করে আস্তে আস্তে বললেন, তোমাদের ছোট্টটিকে ফিরিয়ে এন'।

[বলতে বলতে সরমা কেঁদে ফেলল]

সরমা। [একটু সামলে] তোর মুখের একটা কথাও বিশ্বাস করতুন না। কিন্তু তুই এ সব করবার কে! বাবার সেই শেষ ব্যাকুলতা!...আমাদের ওপর ভরসা করতে পারলেন না; নিজেই গিয়ে তোকে এমনি করে ফিরিয়ে এনে দিলেন।

[সরমা আবাব কেঁদে ফেলল]

সরমা। হত্যা দিলি পেলি কিছু ?

উমা। পেয়েছি।

সরমা। কি ?

উমা। শেষের দিন তখনও ভোর হয নি, উঠে এসে মাকে সব বললুম।

সরমা। কি বললি ?

উমা। মা আমাকে দুধ পুকুরে স্নান করিয়ে বাবার চরণামৃত খাইয়ে, একটু প্রসাদ মুখে দিয়ে গাড়ী করে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

সরমা। বাড়ী থেকে এখানে এলি ?

উমা। না, মা আমাকে আগে এখানে নামিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

সরমা। এলি যখন কেউ দেখতে পেল না।

উমা। পাছে কেউ দেখতে পায় চিনতে পারে তাই এক ঝুড়ি ফুল মাথায় করে বাড়ীতে ঢুকেই সোজা আমার ঘরে চলে গেলুম। হয়ত' যারা দেখে থাকবে কোন কুটম্ব বাড়ীর ঝি দাসী মনে করে থাকবে।

সরমা। এক ঝুড়ি ফুল ?

উমা। আসবার পথে মা কিনে দিলেন।

সরমা। কেন!

উমা। মা-ত আমার বেশি কথা বলেন না। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, কেউ ফুল দিয়ে ঘর সাজায়, কেউ ফুল দিয়ে পূজা করে।

সরমা। তুই কি করলি, নূতন করে ফুল শয্যার আয়োজন ?

[সদর দরজায় করাঘাত শোনা গেল]

উমা। কেউ এলেন কি দিদি ?

সরমা। আস্মুক ও দিকে কান দিসনি।

[পুনরায় করাঘাত—"ডাক্তার সাহেব"।

উমা। দাদার পেসেণ্ট ?

সরমা। ও দিকে কান দিসনে ; তোর কথা বল।

[আরও জোরে করাঘাত—"ডাক্তার সাহেব"! "ডাক্তার সাহেব"! "ডাক্তার সাহেব"!]

উমা। দিদি, দেখব, কে ?

সরমা। কে আবার! এই একটু আগে যে ধমকানি দিয়ে আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললে!

উমা। তোমাকে ধমকালে! তবে দেখি ত কে।

সরমা। দেখে কি আমার মাথা কিনবি ?

[দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত চলেছে,—"ডাক্তার সাহেব! ডাক্তার সাহেব"! সদর দরজায় একটি কাঁচের চোখ লাগান আছে। সেই চোখের শক্তিশালী কাঁচ দিয়ে আগন্তুককে দেখে উমা ভয়ে বিস্ময়ে ফিরে এল।]

উমা। দিদি, এত দাদার কোন পেসেণ্ট নয়, এ যে সেই জজ সাহেব!

সরমা। থাম্ ছুঁড়ি, মাঝরাতে আদালত থেকে জজ আসবে- তোকে নিয়ে এজলাস বসাতে।

[দ্বারে করাঘাত চলেছে]

উমা। দিদি আমার মনটা ছট্ফট্ করছে উনি কি রায় দিলেন!

একটিবার খুলে শুধু ঐ কথাটা জেনে নিয়ে···(**উদ্‌ভ্রান্তের মত সরমার পায়ের কাছে বসে পড়ে**) যদি খবর খারাপ শুনি, আর এই কাল মুখ নিয়ে তোমাদের সামনে থাকব না, ওঁরই আশ্রয়ে আজ রাতটা থাকব, তারপর যা কপালে আছে ··দিদি বল, খুলে দি।

সরমা। যা খুশী তোর কর।

[উমা সদর দরজা খুলে দিল, খুলতেই ঝড়ের মত প্রবেশ করলেন নিয়োগী সাহেব ; প্রবেশ করেই সামনে উমাকে দেখে তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে সরমা একটি থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নিয়োগী সাহেব তাকে দেখতে পান নি।]

নিয়োগী। আপনি!

উমা। চিনতে পেরেছেন?

নিয়োগী। আমার কি বাড়ী ভুল হল! নেম্-প্লেট ত দেখলুম' এটা ত ডাঃ এস্ সি চন্দ্রের বাড়ী?

উমা। হাঁ তাঁরি বাড়ী।

নিয়োগী। ডাক্তার সাহেবকে খবর দেবেন?

উমা। আমার খবর কি?

নিয়োগী। কিসের খবর?

উমা। আমার মামলার কি রায় দিয়েছেন আজ?

নিয়োগী। কোর্টের কাগজ কোর্টে আছে। আমি এখানে এসেছি আর্ত হয়ে, ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে যেতে।

উমা। আর্ত আমিও ঐ একটা খবরের জন্যে।

নিয়োগী। (**একটু কঠিন ভাবে উমার দিকে চেয়ে, তারপর নরম সুরে**) দেখুন রহস্য করতে মাঝরাতে আমার মত বুড়ো কি ছুটে আসে? ডাক্তার সাহেবকে খবর দিন।

উমা। ডাক্তার সাহেব ঘুমোচ্ছেন।

নিয়োগী। তাঁকে যে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

উমা। কে ডাকবে?

নিয়োগী। আপনি পারেন না?

উমা। কি সম্পর্কে?

নিয়োগী। আমি আপনার বাবার মত; আপনার মত আমার একটি মেয়ে মরছে; রহস্য না করে তার প্রাণটা বাঁচান।

উমা। আমারও প্রাণ এই ঠোঁটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ঐ একটা কথার জন্যে।

নিয়োগী। ডাক্তার সাহেব কি আপনার কেউ হন?

উমা। তিনি আমার ভাশুর।

নিয়োগী। তবে ত আপনি তাঁর পরিবারেরই?

উমা। আর যদি আজ আপনি রায় দিয়ে এই সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে থাকেন! [নিয়োগী সাহেব কঠিন দৃষ্টিতে উমার দিকে চাহিলেন।] …বলুন, আপনার মুখে তা শুনলেই, আর একটি পাও আমি এ-বাড়ীতে রাখতে পারব না; ছুটে গিয়ে আপনারি গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসব! [উমা হাঁপাতে লাগল.. তারপর অতি কষ্টে।] আজকের রাতটা আপনারি বাড়ীতে আশ্রয় নিতে হবে তাহলে!…

নিয়োগী। আজ কোর্ট ছুটি হয়ে গেল, একজন বড় উকিলের মৃত্যুর জন্য। আজ আমি কোন রায় দিই নি।

উমা। ওগো দিদি শোন শোন!

[অন্তরালে সরমার কাছে গিয়ে বলতে লাগল'…"এখনও আমি তোমাদের আছি, এখনও আমি পর হয়ে যাইনি।" সরমার কণ্ঠস্বর—"ছাড ছাড তোর দাদাকে আগে খবরটা শুনিয়ে দি, কি উৎকণ্ঠায় যে তিনি আছেন"—সরমা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি ধরে যেমন উপরে উঠতে যাবে, "মা" বলে নিয়োগী সাহেব তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সরমা থমকে দাঁড়িয়ে গেল]

নিয়োগী। মা, আমার মেয়ের জীবন-সঙ্কট, ফাস্ট ডেলিভারী!

সরমা। আমি খবর দিচ্ছি…

[সরমা সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। নিয়োগী সাহেব কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে উমার সামনে এসে…]

নিয়োগী। দেরি হবে ?

উমা। বসুন না ততক্ষণ।

নিয়োগী। মনটা ছট্‌ফট্‌ করছে।

[নিয়োগী সাহেব অস্থির ভাবে এদিক ওদিক করতে লাগলেন,. ."কত দেরি হবে !"..]

উমা। আচ্ছা জজ সাহেব, আপনি কুমারসম্ভব পড়েছেন ?

নিয়োগী। কুমারসম্ভব ?

উমা। কালিদাসের ?

নিয়োগী। হাঁ। পড়তে হয়েছে।

উমা। রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে পড়েছেন ?

নিয়োগী। সে চোখ কোথা পাব ?

উমা। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন, উমা যখন আপনার রূপ যৌবনে আর ভূষণে ভূষিতা হয়ে স্বামীকে জয় করতে গেলেন, মদনের তীক্ষ্ণবাণ হেনে, তখন মদন হলেন ভস্মীভূত, উমা হলেন প্রত্যাখ্যাতা। তারপর উমা করলেন কঠোর তপ ; উমার তপস্যায় মহেশ নিজে এসে ধরা দিলেন। পড়েন নি ?

[নিয়োগী সাহেব কোন আর জবাব না দিয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে সিঁড়ির দিকে চেয়ে আছেন.. ।]

উমা। জজ সাহেব, আপনি তপোবলে বিশ্বাস করেন ?

নিয়োগী। হ্যাঁ আমি ত' প্রাচীনপন্থী।

উমা। যদি বলি আমারি তপোবলে আমি আজ আদালতের জজ সাহেবকে এখানে ধরে এনেছি।

নিয়োগী। এখানে যিনি এসে পড়েছেন, তিনি কোন আদালতের জজ সাহেব নন ; তিনি একজন আর্ত মানুষ।

উমা। যদি বলি যে রায় আজ আপনার লেখা হয়নি, সে রায় যেন কোনদিন আর লিখতে না হয়।

নিয়োগী। এ কথা শোনবার মত কান এখানে কারোর নেই।

উমা। যিনি নিজে আর্ত, আর একজনের আর্তনাদ শোনবার মত কান তাঁর নেই?

[ঠিক এই সময় সিঁড়ির ওপর ভারী পায়ের শব্দে উভয়েই সেদিকে চেয়ে দেখলেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রবেশ করলেন ডাঃ সুরেশ চন্দ্র, আর পিছনে তাঁর স্ত্রী সরমা। ডাঃ চন্দ্র এই শীতের রাতে বাইরে যাবার মত পোশাক পরেছেন; সরমার গায়েও একটি শাল চড়ান। পিছনে পিছনে মহেশ এল।]

সুরেশ। আপনি এসেছেন?

নিয়োগী। দেখুন ডাঃ চন্দ্র খুব সিবিয়াস্ না হলে এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতুম না।

সুরেশ। গাড়ী এনেছেন?

নিয়োগী। হ্যাঁ।

সুরেশ। চলুন, গাড়াতে যেতে যেতে শুনব কেসটা।

[সুরেশ আগে আগে আর পিছনে পিছনে যেতে গিয়ে উমা নিয়োগী সাহেবের সামনে পড়ল]

নিয়োগী। মা, তুমি আমাকে যা বলতে চাইছিলে তোমার এই অভিভাবককে বল।

সুরেশ। [মুখ ফিরিয়ে ঝাঁজালো কণ্ঠে] কি বলতে চায়?

নিয়োগী। উনি আর বিচ্ছেদ চান না।

সুরেশ। [কঠিন দৃষ্টিতে একবার উমার দিকে চেয়ে, মুখ ফিরিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে মহেশকে বললেন] মহেশ, তুমি বৌমার হাত ধরে ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও।

[দুজনে বের হতে যাবেন এবার সরমা সামনে পড়ল।]

সুরেশ। তুমি?

সরমা। যাব।

সুরেশ। কোথা?

সরমা। সঙ্গে।

সুরেশ। কেন?

সরমা। তোমার নার্স হ'য়ে নয়।

[বলেই আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল। সুরেশ ও নিয়োগী পিছু পিছু গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সরমা ফিরে এল]

উমা। ফিরলে? যাবে না?

সরমা। না যাবে না! তোকে ঘরে তুললুম বলে এই লক্ষণের রাতে খালি বিছানায় শুয়ে আমায় ছট্‌ফট্‌ করতে হবে? আর উনি ধড়ফড় করে রোগী দেখা সারতে গিয়ে রোগীটাকে মারবেন?

মহেশ। তবে ফিরলে?

সরমা। এই তোমাদের জ্বালায়। দেখ, দাদার কথায় এই ছুঁড়িটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে একেবারে ঘরে পুরো না [চাবির গোছা উমার হাতে দিয়ে] এই নে ধর [মহেশকে] আগে কিছু খাইয়ে ওকে সুস্থ কর......খালিপেটে প্রেম হয় না।

মহেশ। তুমিই ভাল জান।

[রাস্তায় হর্ণের শব্দশুনে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে......]

সরমা। জানি বলেই কাছে নিয়ে বসিয়ে খাওয়াতুম আর পাখী পড়াতুম। তা আর হল না, তোমাকে বকলম্ দিয়ে গেলুম। (চলে যেতে যেতে আবার ফিরে উমার গালটি ধরে) বাড়ীসুদ্ধ সবাই ঘুমিয়ে কাদা। আমিও যাচ্ছি; তোর নতুন বাসর ঘরে আড়ি পাততে কেউ নেই।

[নেপথ্যে সুরেশের তীব্র কণ্ঠস্বর, "কি হলো?" সরমা "এইত" বলেই তাড়াতাড়ি চলে গেল। মহেশ গিয়ে সদর বন্ধ করে দিল।]

মহেশ। আঃ! [একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস!]

উমা। অতঃপর?

মহেশ। আর কথা নয়, চল এখন।

[মহেশ উমার হাত ধরবার জন্যে নিজের হাত বাড়াতে, উমা সেই হাতের উপর নিজের হাত রাখল। মহেশ উমার হাতটি ধরে অল্প জোরে নিজের দিকে টানতেই উমার দেহ মহেশের বুকের ওপর এলিয়ে পড়ল, মহেশ সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে না ধরলে, সে হয়ত মাটিতে পড়ে যেত।]

মহেশ। কি হল ?

উমা। মাথাটা ঘুরছে,······পা টলছে······দাঁড়াতে পারছি না, আমাকে বসিয়ে দাও······বসিয়ে দাও······এখুনি পড়ে যাব।

[মহেশ উমাকে বেঞ্চির উপর বসিয়ে দিল।]

মহেশ। আমাকে ধরে বস,···

উমা। ···বসে থাকতেও পারছিনা।

[মহেশ উমাকে চেপে ধ'রে পাশে বসল।]

মহেশ। কি হল ?

উমা। কদিনের উপবাসে আর ধকলে শরীরটা······

মহেশ। এতক্ষণ ত' ঠিক ছিলে ?

উমা। [অতি কষ্টে একটু একটু করে] ···উত্তেজনায়······ উৎকণ্ঠায···তোমাকে হারাবার ভয়ে···শরীরের কথা ভুলে গেছলুম···তোমাকে ফিরে পেয়ে শরীরটা মাথা চাড়া দিচ্ছে !

মহেশ। এতক্ষণ ধরে একটানা বক্‌বক্ করে···

উমা। আর বকতে পারছি না···এখনিই টলে পড়ে যাব··· বুকের ভেতরটা···প্রাণটা বেরিয়ে যাবে নাকি !

মহেশ। চল কিছু খাও···এক কাপ কফি করে দেব ?

উমা। ওসব আর আমি ছোঁব না।

মহেশ। আমাকে ধরে ধরে সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে পারবে ?

উমা। চলবার শেষ শক্তিটা খরচ করে সিঁড়ি ধরে তিন তলা থেকে নেমে এসেছি। এ বাড়ী ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছি, ভাবছি আর এক পা এক পা করে নামছি, প্রতিক্ষেপেই মনে হচ্ছিল এইবার পড়ে যাব, তখন বাবা তারকনাথকে ডাকতে লাগলুম; আকুল হয়ে ডাকছি আর এক পা এক পা করে নামছি,···বাবাকে জানাচ্ছি মরণ যদি হয় এখনই এখানে তুমি আমায় মরণ দাও; আমার মৃত দেহটা যেন ওরা এখান থেকে বয়ে নিয়ে যায়,···জ্যান্ত যেন এ বাড়ীর ফটক আর পার হতে না হয়।

[উমা একটু চুপ করে হাঁপাতে লাগল।]

উমা। কিছু বলছ?

মহেশ। না।

উমা। চোখে জল?

মহেশ। না।

উমা। এক পা এক পা করে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ফটক অবধি পৌঁছে গেলুম কিন্তু পার হতে পারলুম না; হুড়কোতে হাত দিতেই শরীরটা ঢলে পড়ে গেল...মৃত্যুর কোলে।

মহেশ। [উমার শরীরটাকে নাড়া দিয়ে] মরবার সখ কত!

উমা। আচমকা মৃত্যুই আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিল তখন, তা না হলে সাক্ষাৎ দর্শন হলো কি করে?

মহেশ। কার?

উমা। ব্যাকুল হ'য়ে এতক্ষণ যাঁকে ডাকছিলুম, তিনিই কৃপা করে আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন তখন একেবারে কৈলাসে সাক্ষাৎ দর্শন দেবেন বলে।—এ দেহে প্রাণ থাকতে কি সেই দিব্য দর্শন মেলে!—দেখলুম চারিদিকে কত আলো—সামনে রজতশুভ্র তুষার আবৃত কৈলাস শিখরে ধ্যানমগ্ন মহেশ্বর. সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণতা পার্বতী। ঠিক সেই সময় তুমি আমাকে স্পর্শ করলে,—তোমার আঙ্গুলের স্পর্শ পেযে আবার এ দেহে ফিরে এলুম, চোখ চাইলুম তোমাকে দেখলুম।

মহেশ। শেষ হয়েছে, না আরও কিছু বলবে?

উমা। শরীরটা বড্ড ঝিম ঝিম্ করছে!—এখনই যদি মরে যাই তোমার কোলের উপরে?

মহেশ। কি করতে হবে?

উমা। তুমি নিজের হাতে আমায় সাজিয়ে দেবে, ঘরে অনেক ফুল রাখা আছে; তুমি নিজে কাঁধে করে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, আমার খুব ভাল লাগবে।

মহেশ। এই জীবন্ত মানুষটাকে কাঁধে করে ওপরে নিয়ে যেতে পারলে আমার খুব ভাল লাগবে।

উমা। ধেৎ সেটা হবে অশাস্ত্রবিহিতম্ ঘোরম্!

মহেশ। শাস্ত্র-বিহিত কি করতে হবে?

উমা। মরা সতীকে কাঁধে নিয়ে শিবের মত তুমিও আমাকে কাঁধে নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াবে—ভাবতে আমার কি ভাল লাগে!

মহেশ। একটা জ্যান্ত সতীকে সারাজীবন কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে বলেই ত আবার তোমাকে ফিরে পেলুম।

উমা। তা আর হবে না মশায়।

মহেশ। কেন হবে না?

উমা। আসবার সময় বাবার পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এত ডাকলুম, এত ধ্যান করলুম, তবু একবার তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেলুম না কেন? পুরোহিত বলেছিলেন, মাগো, একেবারে অন্তিম সময় না হলে ত' সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায় না।—তাই ভাবছি—

মহেশ। ভাবছ?—কি ভাবছ?

উমা। আজ তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেলুম যখন ··

মহেশ। তখন?

উমা। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রে আজ যখন আমি অগাধে তোমার বুকের ওপর ঘুমিয়ে পড়ব, তখনই,—ঠিক তখনই—মৃত্যু এসে আমাকে ডাক দেবে, আমার উষ্ণ দেহে তার শীতল স্পর্শ ছুঁইয়ে দেবে।

মহেশ। কেউ সে ডাকে সাড়াই দেবে না।

উমা। যদি উমা বলে নাম ধরে ডাক দেয়?

মহেশ। ও নামে কাউকে খুঁজেই পাবে না।

উমা। কোথায় আমাকে লুকিয়ে রাখবে?

মহেশ। আমি তোমার নামটাকেই বদলে দেব।

উমা। [এবার হাসল] একেবারে নামটাকেই বদলে দেবে?—বেশ ত?—কি নাম রাখবে?

মহেশ। উমাবনম্।

উমা। উমাবনম্? বেশ নাম; আমার পছন্দ,—ওর মানে কি?

মহেশ। নামের কি আর মানে হয়। উমাবনম্ ভারতবর্ষের একটি তীর্থস্থান।

উমা। তীর্থস্থান! তীর্থস্থানের নামে আমার নূতন করে নাম-করণ হবে?

মহেশ। নূতন নামে তোমার নবজন্ম হবে।

উমা। আমাদের এই দেশে কত সভ্যতা কত সাম্রাজ্য কালের কোলে মিলিয়ে গেল, কিন্তু আম'দের তীর্থস্থানগুলি, যেখানে মৃত্যুঞ্জয়ের আসন পাতা আছে, সেখানে কালের হস্তক্ষেপ পড়ল না।

মহেশ। তাই ত তীর্থস্থানের নামে নূতন করে এবার তোমার পরিচয় হবে।

উমা। তা হলে ত আর তোমার আমার মধ্যে কালের হস্তক্ষেপ পড়বে না?

মহেশ। না।

উমা। ফের চোখে জল!

মহেশ। তুমিই ত সেই থেকে আমায় কাঁদাচ্ছ!

উমা। আর কেঁদনা; তুমি ত আমার পবিচয়ই পালটে দিলে না, আমাকে যে মৃত্যুঞ্জয়েরও মন্ত্র দিলে।

মহেশ। এবার যাবে?

উমা। হাঁ

মহেশ। তবে ওঠ! ধর আমাকে!...[উমা উঠে দাঁড়াল] পারবে নিজে যেতে না কাঁধে করতে হবে?

[মহেশ উমাকে কাঁধে তোলবার উপক্রম করাতেই ..]

উমা। এই! এই! এই! না! না! না!

[বলেই খুব হেসে উঠল।]

মহেশ। [উমার মুখ চেপে ধরে] চুপ! চুপ! আবার সে-রাতের মত বাড়ীসুদ্ধ সব ঘুম ভেঙ্গে উঠে আসবে।

উমা। না চল, আলোগুলো নিবতে নিবতে চল, আমি তোমায় ধরে ধরে ঠিক উঠে যাব।

[উমাকে ধরে নিয়ে মহেশ সিঁড়িতে উঠতে লাগল। একটু পরে সিঁড়ির আলো নিবে গেল, চারিদিকে আবার অন্ধকার হয়ে গেল। যবনিকা পড়ে গেল।]

খোকা হারিয়ে গেল

নাটকের পাত্র পাত্রী

সান্ন্যাল মশায়

শচী দেবী

শেখর

কৃষ্ণা

দুইজন পুলিস অফিসার

॥ খোকা হারিয়ে গেল ॥

[জন বসতি বিরল একটি গ্রাম : সেই গ্রামের প্রান্তে ছোট্ট একটা ভাঙ্গা বাড়ী। হানাবাড়ী বলে জনশ্রুতি ; তাই বাড়ীটিতে কেউ থাকেই না ; এদিকটায় বড একটা কেউ মাড়ায় না।

বাড়ীটির সামনে ছোট্ট একটু প্রাঙ্গণ। বাড়ী ও প্রাঙ্গণ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দোতলার উপর সামনেটায় ছোট একটু ছাদ। ছাদে দাঁড়ালে সদর দরজা আর তার সামনের পথটি বেশ দেখা যায়।

কৃষ্ণপক্ষের রাত, চারিদিক নিস্তব্ধ আর ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই ছাদে মধ্যবয়স্কা মহিলা একজন এসে দাঁড়ালেন ; আস্তে আস্তে প্রাচীরের কাছে গিয়ে ঝুঁকে রাস্তার এধারে ওধারে যতদূর সম্ভব দেখা যায় দেখতে লাগলেন। মহিলাটিকে আমরা এই নাটিকায় শচী নামে পরিচয় দিব।

পিছনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর স্বামী সান্যাল মশায়, এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক।]

সান্যাল। অমন করে ঝুঁকে দেখ না।

শচী। দেখি একটু।

সান্যাল। ব্যস্ত হলে কি হবে ?

শচী। এখনও ত আসছে না ?

সান্যাল। আসবার এখনও সময় আছে।

শচী। আর একবার দেখব ?

সান্যাল। যদি বাহিরের থেকে কেউ দেখে ফেলে ?

শচী। কে দেখবে ?

সান্যাল। পুলিসও হতে পারে !

শচী। বললে যে ভূতের বাড়ী কেউ ঘেঁষে না।

সান্যাল। আমরা এসেছি।

শচী। আমাদের প্রাণটাই উড়ে গেছে। ভূতে আর কি নেবে ?

সান্যাল। তার হাতের লেখা চিঠি দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছি।

শচী। চিঠিটাও যদি কাছে রাখতে দিতে।

সান্ন্যাল। যে ছেলেটি চিঠিখানি এনে হাতে দিলে, সেই একবার পড়িয়েই কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

শচী। তার হাতের লেখা চিনতে পেরেছ ?

সান্ন্যাল। মুক্তোর মত তার সুন্দর হাতের লেখা, আমার বুকে গাঁথা হয়ে আছে দেখেই চিনেছি।

শচী। তার যে ছিল সবই সুন্দর।

সান্ন্যাল। ছোট্ট একটা চিঠি, তাতেই এই বাড়ীর হদিস এমন নিখুঁত ভাবে দিয়েছে যে কানাও চিনতে পারবে।

শচী। আমায় চিঠিখানি একবার দেখালেও না।

সান্ন্যাল। দেখলে আরও কষ্ট পেতে।

শচী। আর কি লেখা ছিল ?

সান্ন্যাল। সে এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

শচী। কেন ?...কোথায় ?

সান্ন্যাল। লিখেছে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে।

শচী। পড়তে যাচ্ছে ? কোন দেশে ?

সান্ন্যাল। এখন ত যাচ্ছে, হিমালয় ডিঙ্গিয়ে ....

শচী! মানস সরোবরে ? আমাকেও দাও খোকার সঙ্গে তীর্থ করে আসি।

সান্ন্যাল। লিখেছে একটা কঠিন পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়েছে...

শচী। বাছা তাহলে পডাশোনা নিয়েই আছে ?

সান্ন্যাল। আমার মনে হয় বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে গবেষণা করছে।

শচী। বাড়ীতে তোমার বইয়ের পাহাড়, এখানে থেকে এসব করা যেত না ?

সান্ন্যাল। পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে যে গবেষণা করবে, তাকে ত সারা পৃথিবী পর্য্যটন করতে হবে।

শচী। এই পড়া পড়াই কাল হলো !

সান্ন্যাল। সারা বিশ্বের জ্ঞানের আলো যার চোখে পড়েছে সে কি আর ঘরের খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়?

শচী। বই পড়া কি মা বাপকে ত্যাগ করতে শেখায়?

সান্ন্যাল। যথার্থ জ্ঞান গতানুগতিকতার গণ্ডি ভাঙতে শেখায়। লেখাপড়া শিখে মধুসূদন ক্রিশ্চান হয়েছিলেন...সেই ছিল সে যুগের বিপ্লব।

শচী। তিনি ধর্মই ত্যাগ করেছিলেন মাকেও কি ত্যাগ করেছিলেন?

সন্ন্যাল। তাঁব মা একটা আগুনকে পেটে ধরেছিলেন তাই তিনি মাকে জ্বালিয়ে সারা দেশটাকে আলো দিয়ে গেছলেন।

[কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে থেকে পথের দিকে দেখতে লাগলেন]

শচী। আসবে না, নাকি?

সান্ন্যাল। না এলেই হয়ত ভাল হয়।

শচী। আমি যে একটিবার দেখব বলে...

সান্ন্যাল। সে যে কাজ নিয়ে পড়েছে, একদিন হয়ত সে বিশ্ব আলোড়নকারী একটা গ্রন্থের লেখক হবে, জগৎবরেণ্য হবে। আধ ঘণ্টার জন্যে এখানে এসে যদি ফ্যাসাদ বাধে! তাই ভয় হচ্ছে।

শচী। মোটে আধ ঘণ্টা থাকবে?

সান্ন্যাল। তাই ত লিখেছে।

শচী। তবু একবার দেখবার জন্মে মনটায় কি যে হচ্ছে!

সান্ন্যাল। দেখলে ছেড়ে দিতে পারবে?

[শচী কোন কথা না বলে, অন্ধকার পাঁচিলের দিকে গেল। মনে হল যেন কাঁদছে]

সান্ন্যাল। তোমার বাপ্ মা যখন তোমার নাম রেখেছিলেন শচী, তখন কি তাঁরা ভেবেছিলেন, তোমারও ছেলে হবে শুধু কাঁদাবার জন্মে?

শচী। বাছা কি শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?

সান্ন্যাল। ছোট্ট চিঠিখানি শেষ করে লিখেছে, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।

শচী। সে কি? [সান্ন্যাল কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন]

সান্ন্যাল। তোমায় কি বলেছি?

শচী। কি?

সান্ন্যাল। স্কুলের শিক্ষক মহাশয়েরা কলেজের প্রফেসাররা মাঝে মাঝে আসেন ত খবর নিতে। সবাইকে এত মায়ায় জড়িয়ে গেছে!

শচী। তাঁদেরও প্রাণটা কাঁদছে।

সান্ন্যাল। একজন শিক্ষকমশায় পুরনো দিনের একটা কথা বলে গেলেন, তোমাকে বলিনি?

শচী। কি? না ত!

সান্ন্যাল। খোকা তখন ছোট, স্কুলে পড়ে, তখন তাদের ক্লাসে ছাত্রদের একদিন তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, বড় হয়ে তোরা কে কি হবি? এমনি একটা খুশি খেয়ালের কথা,...কত ছেলে কত কি বললে,...তোমার ছেলে কি বললে জান?

শচী। কি?...না!

সান্ন্যাল। তোমার ছেলে বললে বড় হয়ে আমি সন্ন্যাসী হব।

শচী। ওমা!

সান্ন্যাল। ছেলের কথা শুনে ক্লাশে একটা হাসি পড়ে গেল; কিন্তু শিক্ষক মশায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিজের ড্রয়ার খুলে অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' বই খানি পড়তে দিলেন। কতদিন তাকে দেখেছি সেই বইখানি পড়তে।

শচী। তুমি কিছু বলতে না?

সান্ন্যাল। বলব কি! গর্বে আমার বুকখানা দশহাত হয়ে যেত যখন দেখতুম সে শ্রীঅরবিন্দের লাইফ ডিভাইন পড়ছে তন্ময় হয়ে; যখন দেখতুম স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি একটার পর একটা সে পড়ে চলেছে!

[কিছুক্ষণ আবার দুজনে চুপচাপ]

শচী। আসবে না নাকি ?

সান্ন্যাল। আর কখন আসবে ?

[আবার কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ থাকবার পর দরজায় করাঘাত শুনতে পেলেন যেন।]

শচী। ঐ ?

সান্ন্যাল। চুপ। [করাঘাত আরও একটু স্পষ্ট শোনা গেল]

শচী। আমি যাই ?

সান্ন্যাল। চুপ। পুলিসও হতে পারে।

[দরজায় করাঘাত আরও স্পষ্ট]

শচী। খোকা হলে ফিরে যাবে যে ?

সান্ন্যাল। আমি দেখছি ; তুমি একটু আড়ালে থাক।

[সান্ন্যাল অন্ধকার সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেন। কৃষ্ণা ছাদে এসে দাঁড়াল।]

কৃষ্ণা। এল মাসীমা ?

শচী। কি জানি, উনি ত গেলেন দেখতে।

কৃষ্ণা। আমি দেখছি। [পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল।]

শচী। কি ?

কৃষ্ণা। মেশোমশায় দরজার ফাঁক দিযে দেখছেন।

শচী। হে হরি ! হে মধুসূদন !

কৃষ্ণা। ঐ যে মেশোম'শায় দরজা খুললেন,...ঐ যে এসেছে !

শচী। দেখি, দেখি।

কৃষ্ণা। আমি থাকব' ?

শচী। তুমি ? একটু দুধ রাখা আছে ; কাগজ জ্বেলে গরম করে আন। একটি ঠোঙ্গায় সন্দেশ আছে, সত্যনারায়ণের শিন্নি প্রসাদী বাতাসা আছে নিয়ে এস। [কৃষ্ণা যাবার আগে আর একবার দেখল।]

কৃষ্ণা। আসছে।

শচী। তবে যাও, আর দেরি করো না।

[কৃষ্ণা চলে গেল। শেখর ছাদে এল ; ছাদে এসেই শেখর মাকে জড়িয়ে ধরল। পিছনে পিছনে ছাদে এসে দাঁড়ালেন সান্ন্যাল মশায়।]

শেখর। মাগো!

শচী। একি করলি খোকা!

শেখর। মাগো তোমার খোকা হারিয়ে গেছে।

শচী। কেন এমন করলি? আমরা কি দোষ ক'রেছিলুম তোর কাছে?...আমায় ছেড়ে যে একদণ্ড তুই থাকতে পারতিস না?

শেখর। মাগো কেন আদর দিয়ে মানুষ করেছিলে? আদর দিয়ে দিয়ে একগলা জলে ডুবিয়ে রেখেছিলে; ডুব জলে হঠাৎ এল বান, টের পেতেও দিলে না, ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বানের দাপটে ভেসেই চলেছি; এখনও ভেসে আছি; কখন যে ডুবে যাই।

শচী। আমি তোকে ডুবতে দেব না, একবার পেয়েছি যখন আর ছেড়ে দেব না।

শেখর। আমি সব ছিঁড়ে ফেলেছি; সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি; কেবল এক একবাব যখন তোমার কথা মনে পড়ে যায়; সব কেমন হয়ে যায়। সেই ছেলে বেলার মত, "মা যাব, মা যাব" বলে মনটা কেঁদে ওঠে।

সান্ন্যাল ছাদে কেন ভেতরে ওকে নিয়ে চল। বাহিরে কোথাও যদি পুলিস লুকিয়ে থাকে!

শচী। পুলিস? আসুক পুলিস; আমি ওকে ছেড়ে দেব না। মা যশোদার মত আমার নন্দগোপালকে বেঁধে ঘরে পুরে রাখব।

[ঠিক এই সময় মনে হল যেন দূর থেকে গাছের মাথার ওপর টর্চের আলো এসে পড়েছে। সান্ন্যাল চমকে উঠলেন। টর্চের আলো সরে গেল।]

সান্ন্যাল। আমি যতদূর খবর পেয়েছি, পুলিস রেকর্ডে তোমার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ নেই। তুমিই কেবল গা ঢাকা দিয়ে তাদের সন্দেহ বাড়াচ্ছ। আজ এখানে হাতে হাতে ধরা পড় যদি?

[মাকে ছেড়ে দিয়ে শেখর একটু পেছিয়ে দাঁড়াল; কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করল]

শেখর। আমাদের পার্টির কাউকে পুলিস জীবন্ত ধরতে পারবে না। সব সময় এটা কাছে থাকে; হয় পুলিসের জন্যে নয় নিজের জন্যে।

শচী। না, না, খোকা, ওটা আমায় দিয়ে দে,—দে! দে দিবিনি? তবে মার আমারি বুকে ওতে যটা গুলি আছে, আমারি বুকে ছুঁড়ে দে। এমন দগ্ধে দগ্ধে মারার চেয়ে একেবারে শেষ করে দে।

সান্যাল। আমি জানতুম তোমরা একটা সিন্ করবে; আমার এ সবে রাজী না হলেই ভাল ছিল।

শেখর। মাগো, তোমাকে আর বাবাকে ত আমি অনেক আগেই শেষ করে দিয়েছি, পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে নয় একেবারে য়্যাটম্ বম্ মেরে, তোমাকে বাবাকে আর আপন পর যে যেখানে আছে সব ধ্বংস করে দিয়েছি।

সান্যাল। খোকা তোমার সঙ্গে এই গোপন সাক্ষাতে রাজী হয়েছি, কেবল তুমি বেঁচে আছ কিনা তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেতে। আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে তোমায় দেখে; এখন যাও ....

শচী। আমি যেতে দেব না।

সান্যাল। আমাদের চোখের সামনে পুলিস তোমাকে ঐ পাঁচিলের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করবে, সে দৃশ্য দেখবার আগে তুমি যাও!

শচী। না, না, ও যাবে না।

সান্যাল। ছেড়ে দাও ওকে, ছেলেকে চোখের সামনে মরতে দেখতে চাও!

[গরম দুধের ভাঁড, সন্দেশের ঠোঙা ও সত্যনারায়ণের প্রসাদ নিয়ে প্রবেশ করল কৃষ্ণা। তাকে দেখেই শেখর চমকে উঠল ; মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল শেখর। ঠিক সেই সময় ছাদের ওপর জোর টর্চের আলো এসে পড়ল। সান্যাল চমকে উঠলেন।]

সান্যাল। পুলিস! গন্ধ পেয়েছে! খোকা লুকিয়ে পড় যেখানে পার।

[টর্চের আলো সরে গেল ; আবার অন্ধকার]

সান্ন্যাল। খোকা? খোকা কোথায় গেল? কোথায় লুকাল?

কৃষ্ণা। আপনারা নিচে নেমে যান, পুলিস এসে পড়বার আগে।

সান্ন্যাল। খোকা?

কৃষ্ণা। সে ঠিক লুকিয়েছে; আপনারা আর এখানে থাকবেন না।

[কৃষ্ণা তাঁদের দুজনকে ঠেলে সিঁড়ি ধরে নিচের দিকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল।]

শচী। [ফিরে এসে] খোকা না খেয়ে গেল!

কৃষ্ণা। আমি পুলিসকে ঠেকিয়ে রাখছি কিছুক্ষণ। সে পালাবার সময় পাবে। মাসীমা এগুলি এখন নিয়ে যান।

[দুধ সন্দেশ মায়ের হাতে দিয়ে তাঁদের দুজনকে অন্ধকার সিঁড়িতে নামিয়ে দিলে।]

শচী। [আবার ফিরে এসে] খোকা না খেয়ে চলে যাবে?

কৃষ্ণা। একতলার অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে থাকুন; তাকেও নিয়ে যাচ্ছি; না খাইয়ে যেতে দেব না।

[শচী দেবীকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়ে ফিরে এসে কৃষ্ণা দেখল শেখরকে]

কৃষ্ণা। একবার চেয়েও দেখবে না?

শেখর। কেন?

কৃষ্ণা। চিনতে পার কিনা?

শেখর। আর ফিরে তাকাই কেমন করে?

কৃষ্ণা। তবু।

শেখর। না।

কৃষ্ণা। না কেন?

শেখর। জান না?

কৃষ্ণা। তখন কি আমায় দেখতে পেয়েছিলে?

শেখর। আমার চোখ তখন নিজের চোখে ছিল না।

কৃষ্ণা। তবে আমায় দেখলে কি করে?

শেখর। হয়ত' ঠিক তখন তুমি আমার মনের মধ্যে ছিলে।

কৃষ্ণা। আমি ছিলুম তখন সামনে।

শেখর। তবে ত সবই দেখেছ।

[আবার ছাদে টর্চের আলো এসে পড়ল। কৃষ্ণা পাঁচিলের সামনে বসে দেখে এসে]

কৃষ্ণা। পুলিসই ঠিক। সংখ্যায় অনেক, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে।

শেখর। ঠিক আছে।

কৃষ্ণা। এত অল্প সময়ের খবরে তুমি এলে, পুলিসের কানে খবরটা পৌঁছল' কি করে?

শেখর। মৃত্যুকে সামনে রেখে যারা পথে চলে তাদের মনের কাঁটা ঠিক এক বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকে। কেন? কি? এ পাশে ওপাশে মনও দেয় না চোখও যায় না। মনের দীপশিখাটি একটু কাঁপলেই পথ ভুল হবে। তুমি ওদিকটা দেখ আমার দিকে না।

[কৃষ্ণা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল। শেখর তখন সেই-ছাদের কোনে রাখা একটি বড়-ড্রাম পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। কৃষ্ণা ফিরে এসে দাঁড়াল ; মুখ চোখে উদ্বেগ।]

কৃষ্ণা। সংখ্যায় অনেক, বাড়ীটিকে ঘিরছে।

শেখর। ছদ্ম আবরণে এ আমার আশীর্বাদ!

কৃষ্ণা। [আবার একবার দেখে এসে] ওরা পজিসান্ নিচ্ছে।

শেখর। যখনই কুমারকে মনে পড়ে যায়, মৃত্যুর পদধ্বনি আশীর্বাদ বলে মনে হয়।

[আবার ছাদের ওপর টর্চের আলো এসে পড়ল]

কৃষ্ণা। [আবার দেখে এসে] ইতস্ততঃ করছে ; কিছুটা সময় নেবে।

শেখর। অনেকদিন পরে মনটাতে একটা আনন্দের অনুভূতি পাচ্ছি।

কৃষ্ণা। বাবা মাকে অনেকদিন পরে দেখলে।

শেখর। শেষ বিদায় নিতে এসেছি।

কৃষ্ণা। আমি এসেছি রুখতে।

শেখর। [হেসে ফেলে] যেতে নাহি দিব?

কৃষ্ণা। দেখে আসি।

শেখর। (কৃষ্ণা ফিরে আসতে) তবু যেতে দিতে হয়।

কৃষ্ণা। মশা মারতে কামান দাগার আয়োজন।

শেখর। আমি মশা? এত ছোট?

কৃষ্ণা। তোমায় ছোট কে বলে? শির নেহারি তোমারি নতশির চির হিমাদ্রির।

শেখর। এ উপমা সত্যি যাঁকে দেওয়া চলত, তাঁর সুউচ্চ চূড়ায় আমি উঠতে গেছলুম, বিশাল এক তুষার স্তূপ খসে পড়ে আমাকে মাটিতে ছিটকে ফেলে দিলে।

[কৃষ্ণা আবার কিছুক্ষণ পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে বাহিরের আয়োজনটা দেখে এল।]

কৃষ্ণা। আচ্ছা তোমরা দুজনে কি কখনও একসঙ্গে কোন শ্মশানে বেড়াতে গেছলে?

শেখর। গেছলুম। তার কি কিছুই তুমি জান না?

কৃষ্ণা। সে বলেছিল একদিন সব তোমায় বলব, বলতে বলতে আর বলা হয়নি।

শেখর। সব বলা হয়নি?

কৃষ্ণা। বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল', সেই তার শেষ রাত।

[কৃষ্ণা আবার পাঁচিলের কাছে গেল দেখতে।]

শেখর! বাকীটা আমার কাছে শোন (আত্মগতভাবে) আমারও আজ শেষ রাত!

কৃষ্ণা। [ফিরে এসে] ওদের মতলব বোঝা যাচ্ছে না। তুমি বল।

শেখর। একদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলুম আমি একা, পিছন থেকে এসে কুমার ধরল; এ কথা কুমার বলেছে তোমাকে?

কৃষ্ণা। না।

শেখর। হাতে তার একখানি কৃষ্ণকুমারী নাটক।

কৃষ্ণা। হাঁ আমিই পড়তে দিয়েছিলুম।

শেখর। আমাকেও একখানি পডতে দিয়েছিলে।

কৃষ্ণা। হাঁ।

শেখর। কেন?

কৃষ্ণা। আমার কথা পরে শুনো; তোমাদের কথা আগে বল।

শেখর। তুমি কুমারকে পড়তে দিলে এই নাটক ঠিক তখনই যখন তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার পরিকল্পনা একেবারে পাকা করেই সে গেছল তোমার কাছে প্রস্তাব করতে?

কৃষ্ণা। হাঁ।

শেখর। ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে তুমি আমাকেও ঐ একই নাটক পড়তে দিয়েছিলে?

কৃষ্ণা। হাঁ।

শেখর। আমার বাবা মার তুমি ছিলে অতি আদরের পাত্রী, আমাদের ঘরে যখন তোমার আগমন অবধারিত।

[ছাদের উপর আবার টর্চের আলো পডল, কৃষ্ণা গেল দেখতে।]

কৃষ্ণা। [ফিরে এসে] সময় পাবে, বল।

শেখর। দুজনে দুজনের মন বুঝতে পুরোনো দিনের সব কথা কইতে কইতে গঙ্গার ধার ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়ালুম নিমতলার শ্মশানের সামনে; থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম।

কৃষ্ণা। এটুকুও বুঝতে পারলে না, তখন তোমাদের দুজনের জন্যে সেখানে নিয়তি কি ফাঁদ পেতেছিল?

শেখর। দুজনেই দুজনের কথা ভুলে গেলুম একটি শববাহীদলকে তখন শ্মশানে ঢুকতে দেখে।

কৃষ্ণা। এই পর্যন্ত বলেই তার কথা আটকে গেল, বললে...পরে বলব। কাকে দেখেছিলে সেদিন তোমরা সেই শবাধারে?

শেখর। একটি অতি সুন্দরী তরুণী, যেন ঘুমোচ্ছে।

কৃষ্ণা। এতক্ষণে বুঝতে পারছি, তার জীবনের ট্রাজেডি কোথা থেকে সংক্রামিত হল। সবটা শুনতে হবে, দাঁড়াও ওদিকটা আর একবার দেখে আসি।

শেখর। সবটা শুনতে হবে!

কৃষ্ণা। [দেখে এসে] বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

শেখর। কেন?

কৃষ্ণা। শেষ পর্যন্ত বাড়ীটা প্রদক্ষিণ করে ওরা হয়ত ফিরে যাবে।

শেখর। সারারাত বাড়াটা অবরোধ করে রেখে ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কৃষ্ণা। বাড়িটার একটা সুনাম আছে ত!

শেখর। ভোর হবার আগেই পাখী উড়ে যাবে।

কৃষ্ণা। ভূতের ভয় যদি থাকে তবে ভূত হয়েই।

শেখর। তাহলে তোমার দুই সামন্ত নৃপতির গল্প শোন।

কৃষ্ণা। সামন্ত নৃপতির গল্প আমার জানা, শ্মশানে কি করলে তাই বল?

শেখর। শবাধারটি নামিয়ে রেখে শববাহীদের দল এদিকে ওদিকে একটু সরে গেল। রইল একা দাঁড়িয়ে একটি তরুণ, অতি কাঁচা বয়স। তখন আরও দুর্জন এসে দাঁড়িয়েছে দেখবার জন্যে। আমি তরুণটিকে প্রশ্ন করলুম—কার? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে কুমার, আমাদের পাঁচজনের, মহাপ্রস্থানের পথে চলতে চলতে দ্রৌপদীর পতন হয়েছে, আমরা পঞ্চ পাণ্ডব তাই দাঁড়িয়ে দেখছি। তরুণটির চোখে জল এল, বুঝলুম,—

কৃষ্ণা। তিনিই স্বামী?

শেখর। এত বড় সান্ত্বনা, আর হয়ত কেউ তাকে দেয়নি।

কৃষ্ণা। কুমার তখন?

শেখর। তারও চোখে জল, এক দৃষ্টে চেয়ে আছে মৃতার মুখের দিকে, বিয়োগ বেদনা যেন তারও। তাকে টেনে এনে ঘাটে বসলুম দুজনে।

কৃষ্ণা। কুমার কাঁদছিল ?

শেখর। ঘাটে বসেও কুমার কোন কথা বললে না, কাঁদতে লাগল।

কৃষ্ণা। কতক্ষণ কাঁদলে ?

শেখর। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যেতে আমি ফেরবার জন্যে তাগিদ দিলুম, সে নড়ল না।

কৃষ্ণা। তাকে ভূতে পেয়েছিল ?

শেখর। কিছুতেই যখন তাকে টেনে আনতে পারলুম না, আমি রাগ করে উঠে এলুম

কৃষ্ণা। তাকে ঐ অবস্থায় একলা ফেলে রেখে ?

শেখর। তখনও সে কাঁদছে, আমি যাচ্ছি দেখে ডাকলে, শোন।

কৃষ্ণা। মানুষটা মরে যায় কিন্তু অতৃপ্ত কামনা মরে না, একটা অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়

শেখর। আমায় ডেকে বললে, কৃষ্ণার সব দাবি আমি ছেড়ে দিলুম, তুই ওকে বিয়ে করে সুখী হ।

কৃষ্ণা। তখন কি তাকে ভূতে পাওয়ার মত দেখলে ?

শেখর। ঘাট থেকে উঠে এসে আবার সেই চিতার পাশে গিয়ে বসল। তখন সবে চিতায় আগুন দেওয়া হয়েছে। হাত ধরে কত টানাটানি করলুম সে এলই না বরং উঠে ধাক্কা দিয়ে আমায় ঠেলে দিলে। আমিও রেগে গেলুম, রাগ করে চলে এলুম।

কৃষ্ণা। তখন ত' সে ভূতগ্রস্থ অন্য মানুষ।

শেখর। তখন বুঝতে পারিনি, পরে কত অনুতাপ করতে হয়েছে।

কৃষ্ণা। ভবিতব্য।

শেখর। অনেক রাত্রে সেদিন কুমারের বাড়ী থেকে খোঁজ নিতে এল—কুমার ফেরেনি। কুমার ফিরল না ; সে রাত্রে নয়, তার পরের দিনও নয়, তারপর কোনদিনই নয়।

কৃষ্ণা। নিজের সঙ্গে তার চলেছে তখন দ্বন্দ্ব ; নিজেকে ব্যাধি-মুক্ত করতে সে একটা আসুরিক চিকিৎসা করলে নিজের ওপর।

শেখর। কুমারের নিরুদ্দেশ হওয়াটায় প্রচণ্ড আঘাত পেলুম, মনে হল সমস্ত অপরাধ আমার।

কৃষ্ণা। একটা মানুষ কত আয়েসী কত উচ্চাভিলাষী, সুখের জন্যে একটা ঘর বাঁধবার জন্যে কত আশা করেছিল।

শেখর। এই সময় গান্ধীজীর একটা রচনা আমার জীবনে নতুন আলোকপাত করল। গান্ধীজী লিখেছেন, বিবাহ মানে স্বার্থপরতা, স্বার্থপরতাই হিংসা। মনে হল, আমাকেই লক্ষ্য করে গান্ধীজী এটা লিখে গেছেন। মন থেকে এই হিংসার বীজ একেবারে নির্মূল করে ফেলব, এই সংকল্প নিয়ে হন্যের মত কুমারকে খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। তাকে খুঁজে আনবই, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবই!

কৃষ্ণা। দাঁড়াও ওদিকটা আর একবার দেখে আসি।

[পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণা দেখে এল।]

শেখর। কি?

কৃষ্ণা। সব চুপচাপ, তুমি বল।

শেখর। তিন মাস অবিশ্রান্ত চেষ্টায়ও যখন তার কোন হদিস পেলুম না, তখন একদিন সমস্ত সকালটা বসে বসে প্রার্থনা করলুম; তন্ময় হয়ে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে করতে কে যেন কানে এসে মন্ত্র দিয়ে গেল—"ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে"। যিনি এই মন্ত্র আমার কানে দিলেন, তাঁকে দেখতে পেলুম না; তবু তাঁকেই ধ্যান করে সংকল্প গ্রহণ করলুম, এই মন্ত্রই আমার জীবনের ব্রত হবে। আশ্চর্য এই সংকল্প গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন হাত ধরে পথ দেখিয়ে ঠিক কুমারের কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় হাজির করলে।

কৃষ্ণা। তোমাকে দেখেই চমকে গেল?

শেখর। কোন ভাবান্তর নেই, যেন চেনেই না, কোনদিন চিনত না।

কৃষ্ণা। সেই শ্মশানে একলা ফেলে রেখে আসবার পর, এতদিন পরে কি রকম তাকে দেখলে?

শেখর। দেখলুম আশ্চর্য রকম শান্ত ; ভেতরে বাইরে এতটুকু ঢেউযের কাঁপন কোথাও নেই।

কৃষ্ণা। শ্মশানের সেই ভূতে পাওযা মানুষটা ?

শেখর। মনে হল ভূতনাথের মত সব জয করে আপনাতে আপনি ধ্যানমগ্ন হ'যে আছে।

কৃষ্ণা। প্রথমে কি কথা হল ?

শেখর। কিছু না, আমি মুখ খোলবার আগেই আমাকে থামিযে দিযে বললে, আর একটি কথাও নয কেউ তোকে দেখে ফেলবার আগে এখান থেকে চলে যা। আমি বললুম, আমি তোকে সঙ্গে করে ফিরিযে নিযে যেতে এসেছি।

কৃষ্ণা। কি বললে সে ?

শেখর। বললে, জলে যে ডুবছে তাকে তুলতে এসেছিস, নিজেই যে ডুববি। হলও তাই। আমি বন্দী হলুম।... ওদিকটা ?

কৃষ্ণা। [শেখর এসে] না ভেতরে আসবাব কোন আযোজন দেখা যাচ্ছে না।

শেখর। দ'ল ভর্তি হ'যেই প্রথমেই আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলুম, বন্দুকের নলই শক্তির উৎস এ কথা তুই বিশ্বাস করিস ? সে সংক্ষেপে জবাব দিযেছিল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই গীতার উৎস, নিজের জীবন দিয়ে তাই সত্যি বলে জেনেছি।

কৃষ্ণা। গীতার 'অভযম' যদি কোথাও থাকে আমি তাঁর মধ্যে দেখেছিলুম।

শেখর। তারপর একটু হেসে বললে, তুই সন্ন্যাসী হবার সখ করেছিলি, এই পথই কর্মযোগের সর্টকাট।

কৃষ্ণা। তোমার মা বাবাকে আমি প্রবোধ দিলুম যেখান থেকে হোক আমি খুঁজে আনবই।

শেখর। যে ঠিকানা খুঁজতে আমাকে মাথা খুঁড়তে হয়েছিল, সে ঠিকানায তুমি অত সহজে পৌঁছে গেলে কি করে ?

কৃষ্ণা। যদি বলি সুন্দর মুখের জয সর্বত্র।

শেখর। জয় নয় বিপর্যয়, যা তুমি ঘটালে।

কৃষ্ণা। আমায় দেখে তোমরা চমকে উঠেছিলে?

শেখর। খুব বিব্রত হয়েছিলুম।

কৃষ্ণা। পরিচিত মুখ দেখলে ত মানুষ খুশীই হয়?

শেখর। তখন আমরা দুজনেই একটা কেন্দ্রে মনটাকে গেঁথে ফেলেছিলুম সেই কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছিল; কিন্তু আমাদের দুজনের মন সেই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির শান্ত হয়েছিল। এমনি করে সেই উত্তাল ঝড় ঝঞ্ঝায় মনটাকে শান্ত করে রাখবার কৌশল কুমারই আমায় শিখিয়েছিল।...তোমায় দেখে প্রথমেই শঙ্কা জাগল, যদি মনটা ঐ স্থির বিন্দু থেকে একটু সরে যায়, তাহলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে কোথায় যে ছিটকে যাব।

কৃষ্ণা। আমি গেছলুম এই ঘূর্ণিপাকের পরিধির বাইরে তোমাদের টেনে আনতে; তোমার বাবা মাকে সেই আশ্বাসই আমি দিয়ে গেছলুম।

শেখর। কুমার বললে দেখনা, ওকে আমি যেমন করে হ'ক সীমানা পার করে দিয়ে আসব।' আমি ভয় পেলুম—পারবে কি? সে সাহস দিয়ে বললে, যদি মরি একজনেই মরব। তোমায় বাঁচিয়ে যাব। তাই করলে।

কৃষ্ণা। কি অন্ধকার সেই রাতটা ছিল! আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টিও পড়ছিল, কেউ তখন বাইরে ছিল না। কোথা থেকে সে এসে আমাকে যেন ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে গেল পার্টির এলাকার বাইরে। আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই সে আমাকে চমকে দিয়ে বলেছিল, সব ঠিক করে রেখেছি, আজ রাত্রেই আমাদের বিয়ে। হলও তাই। জনবসতি বিরল এক গ্রামের বাড়ীতে, আগে থেকে সব আয়োজন করাই ছিল, বিয়ে হয়ে গেল। বাসরে আমি প্রশ্ন করলুম, "অতঃপর কি?" সে বললে, "শুধু আজকের রাতটা আমি বর তুমি বধূ; তুমি ঘুমিয়ে পড়লেই, ভোর না হতে হতেই আমি তোমাকে

অচেতন ঘুমঘোরে রেখেই চলে যাবো।" "কোথা ?" বলেছিল—"ফ্রণ্টে কামানের মুখে। সোলজারদের বিয়ে এমনি করেই হয়।" আর বলেছিল,—"তুমি কিন্তু আর সেখানে ফিরতে পারবে না।" "কোথায় যাব ?" বললে, "তোমাদের বাড়ীতে।" "মাথার সিঁদুর নিয়ে কি বলব ?" বললে, "তবে সেও শেখরদের বাড়ীতে ; আশ্বাস দিও আমরাও ফিরছি।"

[কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ করে রইল।]

কৃষ্ণা। ভোর রাত্রে তার ঘুম ভাঙল না। তাই সেদিন ফেরা হল না। পরের দিন যাবার কথা, যাওয়া হল না,...তারপরের দিনও না ...তারপরের দিনও না...আর কোন দিনও না।

শেখর। তোমাদের পলায়নে পার্টি কমাণ্ড সন্দিগ্ধ হল।

কৃষ্ণা। বুঝতে পেরেছিলুম, তাই কোন একস্থানে এক রাতের বেশি কাটায়নি। শেষে যখন রেস্ত ফুরিয়ে গেল, তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কিন্তু সেখানে দু-রাতও কাটল না।

শেখর। আমাদের বাড়ীতে ধরা পড়ায় তোমাদের লুকিয়ে রাখার অপরাধে আমি অপরাধী সাব্যস্ত হলুম। গুপ্তচর বলে কুমারের মৃত্যুদণ্ড হল ; আর আমার উপর হ'ল সব থেকে কঠিনতম দণ্ডাদেশ।

[নিঃশব্দে অতর্কিতে অন্ধকার সিঁড়ির মুখে কজনকে দেখামাত্র শেখর অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাশে রাখা বড় ড্রামটির ভিতর নেমে পড়ল। এত চটপট যে কৃষ্ণাও টের পেল না। কৃষ্ণা চমকে এদিক ওদিক দেখছে এমন সময় মুখের উপর উজ্জ্বল টর্চের আলো পড়ল,—সামনে পিস্তল উঁচিয়ে দুজন পুলিস অফিসার। তাঁদের দেখামাত্র কৃষ্ণা শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজে ছাদের একটি কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠল ; তীব্র আর্তনাদ, যেন হঠাৎ সামনে বাঘ দেখল। অফিসার দুজন টর্চের আলো কৃষ্ণার পায়ের তলায় ফেলে তার দিকে এগোতে লাগলেন।]

কৃষ্ণা। আমায় কেন মারবে ? একজনকে ত মেরেছ !

১ম অফিসার। কোথায় ? কাকে ?

কৃষ্ণা। কোথায়? কাকে? এই দুটো চোখের সামনে দিনের আলোতে তাকে গলির মধ্যে…রক্তখেকো পশুর দল, তাইতে সাধ মেটেনি, আবার আমার পেছু নিয়ে বেড়াচ্ছ!

অফিসার। কে তোমার পেছু নিয়েছে?

কৃষ্ণা। কে তোমার পেছু নিয়েছে? ন্যাকামি হচ্ছে! আমি কি পুলিসে খবর দিতে গেছি? তবে কেন আমাকেও সরিয়ে ফেলতে চাও!

অফিসার। তোমার ভুল হচ্ছে, আমরা পুলিস, সমাজ-দ্রোহী কেউ নই।

কৃষ্ণা। আবার পুলিস সেজে এসেছ! ভেক। (কৃষ্ণা কেঁদে উঠল) কি করেছিল সে অপরাধ? পার্টিও ছাড়েনি, পার্টির ডিসিপ্লিনও ভাঙ্গেনি, শুধু বিয়ে করেছিল, সোলজাররা বিয়ে করে না? বিয়ে করবার পরও কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে না?

অফিসার। শোন, একটু শান্ত হও।

কৃষ্ণা। শান্ত হব বলেই ত এই ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীতে এসে লুকিয়েছি; এখানে পর্যন্ত পেছু নিয়েছ? সারাদিনটা ছুটছি ত ছুটছি। ছুটতে ছুটতে এখানে এসে লুকোলুম, তাও নিস্তার নেই, যমের মত এখানেও এসে দাঁড়িয়েছ।

১ম অফিসার। মাথার গোলমাল মনে হয়?

২য় অফিসার। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, ব্রেন পরিষ্কার; সবটাই চালাকি, কেবল ধোঁকা দেবার চেষ্টা!

১ম অফিসার। কি করা?

২য় অফিসার। য়্যারেস্ট।

কৃষ্ণা। তাঁকে খুন করে আমাকে বিধবা করেছ। আমি আবার বিয়ে করতে পারি। কিন্তু তাঁকে হারিয়ে তোমাদের পার্টি দেউলিয়া হ'য়ে গেছে। বিশ্বের দৌলত দিয়ে তোমাদের ভাঁড়ার পূর্ণ হবে না।

২য় অফিসার। একে নিয়ে চলুন; অনেক কিছুর হদিস মিলবে।

১ম অফিসার। তোমাকে য়্যারেস্ট্ করলুম ; চল থানায়।

কৃষ্ণা। খুন যদি না করলেই নয়, এইখানে আমাকে খুন কর। ঐ এঁদো জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরো না এইখানে খোলা আকাশের নিচে তারা দেখতে দেখতে আমাকে মরতে দাও।

[তাকে ধরবার জন্যে এগোতেই পুলিস অফিসার ও কৃষ্ণার মাঝখানে ফুটে উঠল একটি ছায়া মূর্তি। বুকের পাঁজরের উপর গভীর ক্ষত।]

অফিসারদ্বয়। একি! এ কে!

[তাঁরা একসঙ্গে টর্চের আলো ফেললেন সেই ছায়া মূর্তির উপরই। সঙ্গে সঙ্গে ছায়া মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কিছু দেখা গেল না।]

১ম অফিসার। কি হল?

[দুজনেই টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখলেন। কোথাও কিছু দেখা গেল না। তাঁরা টর্চের আলো নিভিয়ে দিলেন, আবার অন্ধকার, অন্ধকারের বুকে আবার এসে দাঁড়াল সেই ছায়ামূর্তি, এবার আরও স্পষ্ট। আবার অফিসারদ্বয় টর্চের আলো ফেললেন, সে আলোতে আর কিছুই দেখা গেল না। আবার অন্ধকার, আবার ছায়ামূর্তির আবির্ভাব।]

২য় অফিসার। ফটো নিন্, অনেক তথ্য জানা যাবে।

[১ম অফিসার কাঁধে ঝোলান ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করলেন,... ক্লীক্ করে শব্দ হল কিন্তু সেই সঙ্গে যে আলোর ঝলক্ বের হল তাতেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল।]

২য় অফিসার। না, উঠবে না।

১ম অফিসার। কোথা থেকে যেন একটা ফোকাস এসে পড়ছে!

[তাঁরা দুজনে ঘুরে ঘুরে আশেপাশের গাছের মাথাগুলো দেখতে লাগলেন টর্চের আলো ফেলে ফেলে।]

কৃষ্ণা। ওরে মূর্খ! এ আলো পরলোকের।

অফিসারদ্বয়। চালাকি!

[বলেই দুজনে একসঙ্গে দুপাশ থেকে কৃষ্ণাকে ধরতে যেতেই, কৃষ্ণা আবার একটু পিছিয়ে গিয়ে তীব্রকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসারদ্বয় ও কৃষ্ণার মাঝখানে এসে আবার দাঁড়াল সেই ছায়ামূর্তি। আবার, ঠিক সেই সময় শেখর অন্ধকার ড্রামের মধ্যে উঠে দাঁড়াল ;

ড্রামের মধ্যে কি ছিল তার সর্বাঙ্গ আলকাতরার মত কাল রংয়ে ছোপানো হয়ে গেছে ; তার উপর সর্বাঙ্গে খড আটকে তাকে এক বীভৎস মূর্তিতে দেখা গেল। অফিসারদ্বয় এই উভয় মূর্তির সামনে যেন বেশ/ভমত খেয়ে গেলেন। কৃষ্ণা তখন খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল]

কৃষ্ণা। তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যায়।

১ম অফিসার। যা শোনা গেছল সত্যিই এটা হানাবাড়ী।

২য় অফিসার। তাই ত দেখছি।

১ম অফিসার। মেয়েটা পাগলী, কিংবা ডাইনী।

২য় অফিসার। যাদের খোঁজে আসা তাদের আড্ডা নয়।

১ম অফিসার। আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে।

২য় অফিসার। চলুন যাওয়া যাক।

[সিঁড়িতে তীব্র টর্চের আলো ফেলে অতি ক্ষিপ্র পদশব্দে তাঁরা চলে গেলেন। ক্রমে দূরে আরও অনেক পদশব্দে বোঝা গেল, পুলিস-বাহিনী সব চলে গেল। কৃষ্ণা পাঁচিলের সামনে দাঁড়িয়ে সব দেখে এল।]

কৃষ্ণা। সব চলে গেল। এবার নিষ্কৃতি। বেরিয়ে এস।

[শেখর লাফিয়ে ঐ ড্রামের বাইরে এসে দাঁড়াল। তার জামা কাপড় আলকাতরায় মাখামাখি। মুখে, সারা গায়ে আলকাতরা।]

কৃষ্ণা। তুমি জামাটা খুলে ফেল।

[শেখর জামাটা খুলে ফেলতে কৃষ্ণা তার মাথা মুখ সারা গা অতি সযত্নে আপনার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগল।]

শেখর। মনের মধ্যে যেটা শুখিয়েই মরে গেছে ভেবেছিলুম, একটা স্পর্শমাত্রেই সেটা ফণা তুলে ফোঁস করে উঠছে!

কৃষ্ণা। গর্তের মধ্যে সাপ না খেয়ে পড়ে থাকে কতকাল তবু মরে না।

শেখর। তাই কি আচমকা গর্তের মুখে পা পড়লে ছোবল খেতে হয়?

[শেখরের বুকের ওপর অতি কোমল ভাবে হাতখানি রেখে কৃষ্ণা বলল]

কৃষ্ণা। এটা সাপের ছোবল নয়, রাজকুমারের জীবনকাঠি।

[শেখর যেন একটু বিহ্বল হয়ে পড়ল। বুকের ওপর একবার সেই

হাতখানি চেপে ধরল, একবার কৃষ্ণার মুখ তুলে-চাওয়া চোখের দিকে চেয়ে দেখল। তারপরেই যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েই সেই হাতখানি ঠেলে দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ল।]

শেখর। না, না, এই মনের মধ্যে আমি আমার মাকে মেরেছি, আমার বাবাকে মেরেছি, আমার সবচেয়ে যে প্রিয়জন সেই কুমারকে মেরেছি। আমার মন মরে গেছে। তাকে আর বাঁচিয়ে তুলতে যেও না।

কৃষ্ণা। [শেখরকে সামনে ফিরিয়ে] সহজ হও। একটু শান্ত হও।

শেখর। শান্ত? কেন পারছি না হতে? কেন পারছি না স্থিতধী হতে? আমার রক্তের প্রতি কণিকার মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে গেছে, তবুও রক্তের মধ্যে এককণা মিষ্টি স্বাদ কেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি?

কৃষ্ণা। কুমারের শান্ত জীবন অশান্ত করে কে তার রক্তের মধ্যে তুফান তুলেছিল, জান না?

শেখর। কে?

কৃষ্ণা। তুমি জান না? তুমি দেখনি? তোমারি সামনে শ্মশান থেকে কুমার কি কুড়িয়ে নিয়ে গেছল?

শেখর। আমি তখন কত বারণ করেছিলুম—কুমার, দেখিসনি অমন করে, মরাটার দিকে সতৃষ্ণভাবে দেখিসনি। সে শোনেনি।

কৃষ্ণা। সেই মৃতার অতৃপ্ত কামার্তি, কুমারকে অবলম্বন করে, তার সঙ্কল্প, তার ব্রহ্মচর্য, তার দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

শেখর। সংক্রামক ব্যাধি এমনি করে আচমকা কাল ব্যাধি হয়ে দেখা দেয়।

কৃষ্ণা। যখন কুমারের মুখাগ্নি করে পাশে দাঁড়ালুম, যখন তার চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, আমি চোখ বুজে কুমারকে ধ্যান করতে লাগলুম; তন্ময় হয়ে দেখলুম চিতার শিখাধরে একটা শুদ্ধ স্বাধ্যায়পুত আত্মা উপরে উঠে যাচ্ছে। সে উঠে যাবার সঙ্গে

সঙ্গে নিরলম্ব একটা কৃষ্ণছায়া চিতার ভেতর থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপরে ।· তারপর থেকে সেই ছায়া মাঝে মাঝে আমার মধ্যে দুর্বার হয়ে ওঠে। নিজের সঙ্গে কত দ্বন্দ্ব করেছি, কতবার কত সঙ্কল্প করেছি। এমন সময় অতর্কিতে খবর এল তুমি আসছ। ··তুমি এলে···তোমাকে দেখামাত্র আমার সব সঙ্কল্প কোথায় ভেসে গেল ; আমার সেই আর্তি আমাকে তোমার দিকে ঠেলে দিল। তাইত আমার স্পর্শমাত্রেই তোমার স্থিতপ্রজ্ঞ প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুমি কি করবে, তুমি যে আচমকা সাপের গর্তে পা ফেলেছ।

[কৃষ্ণা শেখরের বুকের ওপর মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল, শেখর চঞ্চল হয়ে উঠল।]

শেখর। এমনি করে কাঁদলে, কুমারের মত আমারও হাল হবে না ?

[কৃষ্ণা সহজ হল, সরে দাঁড়াল।]

কৃষ্ণা। এই দেখ, কি পাগলামি করছি! তুমি আলকাতরা মাখা কাপড়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছ ; আর আমি তোমাকে বকাচ্ছি। দাঁড়াও, ফর্সা জামাকাপড় এনে আজ তোমাকে বর সাজাব।

শেখর। এখানে ওসব কোথা পাবে ?

কৃষ্ণা। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি কি খালি হাতে, সব আয়োজন না করেই ?

শেখর। গিন্নিপনা যাঁদের স্বধর্ম...

কৃষ্ণা। তাদের বোবাকান্না পায়ে মাড়িয়ে চলে যেও না।

[কৃষ্ণা চলে গেল। কৃষ্ণা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই ছায়া-মূর্তি শেখরের সামনে এসে দাঁড়াল।]

শেখর। কুমার। [এক দৃষ্টে তন্ময় হয়ে কুমারের দিকে চেয়ে] আমার জন্মক্ষণ থেকে এই দেহটার মধ্যে যে আমি-আমি চেতনটাকে বহে এসেছি, সেই পরমলগ্নে আমার আমি চেতনাটাকে তোমার মধ্যে আরোপ করতে পেরেছিলুম, তাইত তখন তুমিই আমার হাতটা, ধরে

তোমার বুকের উপর ছুরিটা বসিয়ে দিলে, সেইক্ষণ থেকে তুমি চলে গেলে আর আমি তুমিময় হয়ে গেলুম।...

[আবার কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে থেকে]

তুমিই আমাকে পার্টির কাজে কর্মযোগের পথ দেখিয়েছ, এবার পার্টির আদেশে হিমালয় ডিঙ্গিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চলেছি। তুমি আমার হাত ধর, আমি তোমাকেই অনুসরণ করে চলব। তুমি আমার কানে নতুন করে মন্ত্র দাও,—"তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।" ধর আমার হাত।

[শেখর এগিয়ে গিয়ে ছায়ামূর্তির হাত ধরতে গেলেই ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রবেশ করলেন শচীদেবী, সান্যাল মশায় আর পিছনে পিছনে কৃষ্ণা, কৃষ্ণার হাতে একটি ধুতি, গেঞ্জি পাঞ্জাবী ও পরিষ্কার একটি তোয়ালে। শচীদেবীর হাতে গরম দুধের ভাঁড় ও একটি ঠোঙায় প্রসাদী বাতাসা ও সন্দেশ।]

শচী। খোকা, পুলিস চলে গেছে, এখন একটু খেয়ে নাও।

কৃষ্ণা। আগে কাপড়টা পালটে ফেলুক।

সান্যাল। একি হয়েছে ?

কৃষ্ণা। ঐ ড্রামটার মধ্যে লুকিয়েছিল; আলকাতরার মত ছিল কিছু ওতে।

[শেখর কৃষ্ণার হাত থেকে জামা কাপড় নিয়ে একটি অন্ধকার কোণে গিয়ে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গ ভাল করে মুছে নিয়ে পরিষ্কার কাপড় জামা পরে সামনে এসে দাঁড়াল। মায়ের হাত থেকে গরম দুধের ভাঁড় ও সন্দেশের ঠোঙা নিয়ে খেতে খেতে কৃষ্ণাকে পরিত্যক্ত জামা কাপড়গুলি দেখাল। তখন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে, ছাদটায় বেশ আলো ফুটেছে।]

কৃষ্ণা। ওগুলিকে আমি পুড়িয়ে ফেলব।

শেখর। (মাকে) সারাদিনের পর এই খাচ্ছি।

শচী। সারাদিন উপোসে আছিস ?

শেখর। কতদিনই ত থাকি।

শচী। মাগো !

সান্ন্যাল। আজকে আরও খানিকক্ষণ থাকতে পারবে না? একটুখানি ঘুম, আর একটু খাওয়া?

শেখর। আমিত চিঠিতে লিখেছি আধঘণ্টা আমার মেয়াদ।

সান্ন্যাল। আজ একটা বিরাটদল এসেছিল; এখন ত চলে গেছে, আবার কি ফিরবে?

কৃষ্ণা। আর ফিরবে না, ওরা ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

সান্ন্যাল। ভয় কিসের?

কৃষ্ণা। যারা ভয় দেখায়, ভয়ত তাদেরই পদে পদে।

শচী। এতদিন তোকে দেখিনি তবু এক রকম ছিলুম, আজ একবার দেখে আর ছেড়ে দিতে মন চাইছে না।

কৃষ্ণা। আর ছেড়ে দিতে হবে না, আমি ওঁকে বেঁধে রাখব।

শচী। (খুব খুশিতে) পারবে মা?

কৃষ্ণা। আপনার আর বাবার অনুমতি পেলে?

শচী। তুমি ওকে বাঁধবে, তার জন্যে অনুমতি কি মা?

কৃষ্ণা। শুধু মুখের কথায় নয়, যে অধিকারে মানুষ মানুষকে বাঁধতে পারে, সেই অধিকারের অনুমতি চাই মা।

সান্ন্যাল। খুলে বল মা।

কৃষ্ণা। আমি ওকে বিয়ে করে আপনার করে নিতে চাই।

সান্ন্যাল। [আনন্দে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠে] ও। হোঃ! হোঃ! তাই বল। আগে থেকে পরামর্শ করে সব পাকা করে রেখেছ?···খোকা?

শেখর। না।

সান্ন্যাল। কি না?

শেখর। তা হয় না।

সান্ন্যাল। কেন হয় না? বিধবা-বিবাহে আমি উৎসাহ দিয়ে থাকি।

শেখর। নিজে হাতে যাকে বিধবা করেছি, তাকে বিবাহ করতে নেই।

সান্ন্যাল। [বিরক্তি প্রকাশ করে] কি যা তা প্রলাপ বকছ!

শেখর। প্রলাপ নয়, নিজের হাতে আমি, ওরই চোখের সামনে কুমারকে ছুরি মেরে হত্যা করেছি, ওকে বিধবা আমিই করেছি।

সান্ন্যাল। [অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে] য়্যাবসার্ড! তা অসম্ভব! তুমি করবে মানুষ খুন, স্বয়ং ভগবান এসে সাক্ষ্য দিলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না!

শচী। খাওয়া নেই, ঘুম নেই—ওর কি মাথার ঠিক আছে!

সান্ন্যাল। মাথার ঠিক কোথেকে থাকবে, কুমার ছিল ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু; কুমার নিরুদ্দেশ হতেই ও পাগল হয়ে গেছল, দেখনি?

শচী। দেখিনি আবার!

সান্ন্যাল। সেই কুমার বেঘোরে প্রাণটা হারাল!

শচী। পাগলামি করে তুই কি আর তাকে বাঁচাতে পারবি?

সান্ন্যাল। না এইসব বাতুলের মত কথায় প্রকৃত আততায়ী পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পলাতক হবে, আর পুলিস রামের অপরাধে শ্যামকে ঝুলিয়ে দেবে। তুমি এত পড়েছো, এত শিখেছো, তুমি জান না এইসব অসংলগ্ন উক্তির কি ফল হতে পারে?.... (কিছুক্ষণ চিৎকার করে পরে শান্ত হ'য়ে) কুমারকে যেই খুন করুক, কেন খুন করলে? কি তার অপরাধ?

শেখর। কোন অপরাধ নেই; সে ছিল অপাপবিদ্ধ!

সান্ন্যাল। তবে?

শেখর। পার্টির কমাণ্ড।

সান্ন্যাল। পার্টির কমাণ্ড? এই অন্যায়কে কেউ রুখতে পারলে না?

শেখর। বজ্রাঘাতকে কি রোখা যায়?

সান্ন্যাল। যায়। চরিত্রের সেই দৃঢ়তা, সেই শিক্ষা থাকলে।

শেখর। যখন পার্টির কমাণ্ড আমাকে শোনান হল, মাত্র একদিন সময় আমার হাতে। এই চব্বিশ ঘণ্টা আমি কিছু ভাবতে

পারিনি। এক ফোঁটা জলও মুখে দিতে পারিনি, একটিবারও চোখ বুঁজতে পারিনি। শূন্য প্রাণে আবিষ্টের মত বসে থাকতে থ.কতে একসময় যেন একটা ঘোর এল; যেন স্বপ্ন দেখলুম, দেখলুম তোমাকে, ছোট্টছেলের মত আমি তোমার কাছে বসে, তুমি পড়াচ্ছ আমি পড়ছি, "They are not to reason why, they are but to do and die.' [কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে] বাবা, তোমার শিক্ষাতেই আমি বজ্রাঘাত মাথা পেতে নিতে পেরেছিলুম, সৈনিকের মতই পার্টির কমাণ্ড অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলুম।

সান্ন্যাল। [শচীকে] শুনলে তোমাব ছেলের কথা? তোমার খোকা আজও সেই খোকাই আছে, যেমন বুদ্ধিতে তেমনি কথায়।

শচী। আয় খোকা, তোকে একটু ঘুম পাড়াই। কাল ঘুম থেকে উঠে তোর পেটে যত গল্প আছে সারাদিন ধরে শুনব।

সান্ন্যাল। তুমি চলে যাবার পর একদিন পুলিস এসেছিল।

শেখর। বাড়ীতে? কেন?

সান্ন্যাল। কেন তা কিছু বললে না, সাবা বাড়ী ওলট্ পালট্ করে সারা রাত তাণ্ডব কবে গেল।

শেখব। তোমাব লাইব্রেরী ঘবে ঢুকেছিল?

সান্ন্যাল। সারা বাত তোমাব মা আর আমি পুতুলের মত ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম।

শেখর। কত কষ্ট হল তোমাদেব!

সান্ন্যাল। শবীবেব কষ্ট কিছু না। কষ্ট হয়েছিল দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলির জন্যে—কি যে খুঁজছিল।

শেখর। নিষিদ্ধ প্রচার পত্রিকা।

সান্ন্যাল। সে সব ত কিছুই পেল না তাই যত আক্রোশ সব গিয়ে পড়ল আমার সাবা জীবন ধরে সংগ্রহ করা পুঁথিগুলির উপর।

শেখর। সে সব অতি প্রাচীন পুঁথি!

সান্ন্যাল। যখন পুঁথিগুলির কাপড়ের আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে লাগল, যখন আলগা পাতাগুলো হাওয়ায় উড়তে লাগল, কত পাতা

ছিঁড়ে ফেটে ধুলো হয়ে যেতে লাগল, তখন আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছিল।

[শেখর একটু চঞ্চল হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে...]

সান্ন্যাল। কেউ কখনো আমার চোখে জল দেখেনি। তুমি যখন চলে গেলে তোমার মা কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আমি পাথর হয়ে গেলুম, তবু চোখে জল দেখেনি কেউ কোন দিন।..কেবল সেইদিন আমার সারাজীবনের সাধনার সংগ্রহ গুলির ঐ হাল দেখে চোখের জল রুখতে পারিনি।

শেখর। কিছু বলনি তুমি?

সান্ন্যাল। না, বরং আমি তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলুম।

শেখর। কেন?

সান্ন্যাল। তারাই প্রথম আমাদের কাছে তোমার খবর এনে দিলে।

শেখর। কি খবর?

সান্ন্যাল। তোমার মা শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, সে বেঁচে আছে? পুলিস অফিসারটি ভেংচে উঠেছিল।

শেখর। ভেংচে উঠল!

সান্ন্যাল। বললে, বাহাল তবিয়তে।...ঐ খবরটায় একটা ভারী পাথর আমাদের মন থেকে নেমে গেল! এই খবরটা দেবার জন্যে পুলিস অফিসাররা যাই করুন, আমরা তাঁদের উপর খুশীই হয়েছিলুম।

শেখর। তোমাকে ত আমি ছেলেবেলা থেকে সব সময়ে হাসি খুশিই দেখে এসেছি, তোমার চিত্তের সেই সদাপ্রসন্নতা আমার জন্যে যেন কখন ক্ষুণ্ণ না হয়।

শচী। আমরা কেবল বলাবলি করতুম—বেঁচে যখন আছে, ঠিক একদিন ফিরে আসবে সখ মিটে গেলে।

শেখর। সার্চ করে নিয়ে গেছে কিছু?

সান্ন্যাল। সেও একটা হাসির ব্যাপার। যাবার সময় বলে গেল—বড় পিতৃমাতৃভক্ত ছেলে, বাপ-মাকে ফেসাদে ফেলতে কোন প্রমাণই রেখে যায়নি। তবু খালি হাতে ফিরল না, স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' খানা নিয়ে গেল।

শেখর। তাতে কি পেলেন তাঁরা?

সান্ন্যাল। তোমার নিজের হাতে লাল কালি দিয়ে যে অংশটি দাগ দেওয়া ছিল, সেইটুকুর জন্যে।

শেখর। কোনখানটা?

সান্ন্যাল। সেই যে—

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

[শোনবার সঙ্গে সঙ্গে শেখরের মধ্যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হল, সে সকলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আত্মগতভাবে বলল]

শেখর।

"Dance in destruction's dance,
To him the Mother comes"

কৃষ্ণা। ও যে যাচ্ছে?

সান্ন্যাল। না যাবে কেন? [শেখরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে] শোন, আমি মন স্থির করে ফেলেছি, কালই এই বাড়ীতে কৃষ্ণার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

শচী। এখানে কেন, বাড়ীতে নিয়ে সকলকে ডেকে।

সান্ন্যাল। ঠিক বলেছো; এর এই বিয়েতে পুলিস অফিসারদেরও নিমন্ত্রণ করে বুঝিয়ে দেব, আধ্যাত্মতত্ত্ব আর অপরাধতত্ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমা রেখা কোথায়?

শচী। অন্ধকার ঘর-দ্বার আবার আলোয় ঝল্‌মল করে উঠবে!

সান্ন্যাল। তোমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই; মিথ্যে সন্দেহের বশে একটা প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন কখনই এমন ক'রে নষ্ট হ'তে দেব না।

[শেখর পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল; ঠিক সেই সময় আবার সেই ছায়া-মূর্তি দেখা দিল।]

শেখর। ঐ ত! কুমার এসে গেছে; ওকেই জিজ্ঞেস কর বাবা—কে ওকে খুন করেছে? আমার কথা ঠিক না মিথ্যে?

[শচীদেবী তখন পিছন ফিরে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, ছায়ামূর্তি তিনি দেখতে পেলেন না, দেখলেন সান্ন্যাল মশায়। ভূত দেখা মাত্র তিনি অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে সেই ছায়ামূর্তির দিকে তেড়ে গেলেন]

সান্ন্যাল। [চিৎকার করে] Avaunt! and quit my sight.

[তারপর বিড়বিড় করে অত্যধিক উত্তেজনায় কি যে বললেন, কেবল ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠতে দেখা গেল। ছায়ামূর্তি তখনও অপলক দৃষ্টিতে সান্ন্যালমশায়ের দিকে চেয়ে আছে, সান্ন্যালমশায় চিৎকার করে]।

সান্ন্যাল। Thou hast no speculation in those eyes, which thou dost glare with।

[ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। শচীদেবী মুখ ফিরিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না। তিনি সান্ন্যালমশায়কে জড়িয়ে ধরলেন. তখনও তিনি কাঁপছেন অপ্রকৃতিস্থ।]

শচী। কি হ'ল? কি হ'ল?

সান্ন্যাল। অ্যাঁ।

শচী। অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

সান্ন্যাল। আমি? হাঁ আমিই।

শচী। কেন অমন করছ?

সান্ন্যাল। আমিই কুমারকে খুন করেছি।

শচী। অমন ভুল বকে না; চুপ কর, চুপ কর।

সান্ন্যাল। হাঁ আমিই কুমারকে খুন করেছি। কেবল যে বলতুম, শেখর আমার সবার সেরা ছেলে হবে, আমার সেই কথাগুলো আমার সেই ভাবনাগুলো [আবার উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠে] A tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing!

[সান্ন্যালমশায়ের প্রায় চৈতন্য বিলুপ্ত হবার মত হ'ল, তিনি পড়ে

যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণা আর শচীদেবী তাঁকে ধরে ফেললেন, তাঁকে সামলাতে সামলাতে...]

কৃষ্ণা। (চিৎকার করে কেঁদে উঠে) ও যে চলে যাচ্ছে!

শচী। (কেঁদে উঠে) খোকা যে চলে যাচ্ছে!

সান্ন্যাল। (সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে) অ্যাঁ খোকা! চলে যাচ্ছে!

শচী। ঐ যে চলে যাচ্ছে!

[শেখর আস্তে আস্তে অন্ধকার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত বাবা মাকে দেখে নিচ্ছে]

শচী। খোকা, খোকা, যাস্‌নি যাস্‌নি।

সান্ন্যাল। [এতক্ষণে সহজ হ'য়ে] ও যে সত্যি চলে যাচ্ছে! খোকা, খোকা, যেও না ফের, ফের। সব অপরাধ পুলিসের কাছে আমিই আমার ওপর নেব; সব শাস্তি আমি নেব। তুমি তোমার মার কাছে ফিরে এসো, ...ফের ফের, যেও না, যেও না!

[শেখর বাঁ হাতটি তুলে এই মায়ার আকর্ষণ থেকে নিজের দৃষ্টিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলে উঠল..]

শেখর। পিতা নৈব মে নৈব মাতা না জন্ম!

[বলবার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির অন্ধকারে হারিয়ে গেল]

সান্ন্যাল। ধর, ধর, ফেরাও, ফেরাও, ডাক, ডাক!

[সান্ন্যাল নিজেই ছুটে গেলেন তাকে ধরতে কিন্তু ততক্ষণে শেখর সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেছে ..। তারপর পাঁচিল দিয়ে ঝুঁকে সান্ন্যালমশায় চিৎকার করতে লাগলেন।]

সান্ন্যাল। খোকা, খোকা, যেও না, যেও না, ফের ফের, শোন, শোন...ও যে শুনলে না, ঐ যে অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল! [ছাদের মাঝখানে এসে শচীদেবীর দুহাতে ধরে] খোকা কোথায় হারিয়ে গেল!...আমাদের খোকা হারিয়ে গেল!

[ছোট ছেলের মত বিহ্বল হ'য়ে সান্ন্যালমশায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। শচীদেবী ও কৃষ্ণাও কেঁদে উঠল। সেই কান্নার মধ্যে যবনিকা পড়ে গেল।]

শব্দভেদী বাণ

নাটকের পাত্রপাত্রী

ধূর্জটিপ্রসাদ

সারদাপ্রসাদ

শান্তনু

ভবতারিণী

বন্দিতা

দীপ্তি

ছায়া

বঙ্কিমশ্যাম

বেলিফ

নিশানদার

পিয়ন

কুলিগণ

শব্দভেদী বাণ

[একটি রুচিসম্মতভাবে সাজান হলঘর ; এইখানে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত অতিথিগণের সমাগম হবে। হলঘরখানির দুইদিকে দুইটি দ্বার ; একটি দ্বার বাহির থেকে ভেতরে আসবার, অন্যটি অন্দর মহলের প্রবেশ পথ। দুইটি দ্বারের মুখে সুদৃশ্য পরদা। আসবাবগুলির মধ্যে একটি বড় ঘড়ি, দুই পাশে দুইটি আয়না, একটি অর্গান আর সোফাগুলি উল্লেখযোগ্য। হলঘরের দক্ষিণ দিকে আর একটি দ্বার তার মুখেও পরদা, পিছনে গৃহস্বামীর চিত্রশালা।

একটি সোফায় বন্দিতা বসে আছে, সুন্দর মুখখানি আজ বড় বিমর্ষ। প্রবেশ পথে ঝোলান পরদার দিকে উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টিতে কার যেন আগমন প্রতীক্ষা করছে।

প্রবেশ পথের পরদা দুলে উঠতেই বন্দিতা ব্যগ্র হয়ে কয়েক পা আগিয়ে গেল, কিন্তু যাঁর জন্যে ব্যাকুল প্রতীক্ষা তিনি এলেন না। প্রবেশ করল দুই বান্ধবী· দীপ্তি ও ছায়া। দুজনের হাতেই বই।

যাঁর প্রতীক্ষা করছিল, তিনি এলেন না, বন্দিতার কেঁদে ফেলবার মত মুখের ভাব হল, তবুও আত্মসংবরণ করে ম্লান মুখে হাসি টেনে বান্ধবীদের অভ্যর্থনা জানাল।]

বন্দিতা। আয় !

দীপ্তি। কি গো কনে, বর আর কতদূর ?

বন্দিতা। একেবারে কলেজ থেকেই ?

ছায়া। দেখ না, এর পাল্লায় পড়ে এমনি বাঁদর সেজেই,···

দীপ্তি। বাঁদরী বল, ব্যাকরণ ঠিক রাখ।

বন্দিতা। বস।

দীপ্তি। তুই বলেছিলি না সকাল সকাল আসতে—

ছায়া। মা একা—তাঁকে সাহায্য করতে।

দীপ্তি। এখানে আর বসব কেন, চল মায়ের কাছে যাই।

ছায়া। মায়ের কাছে যাবার আগে, উপহারটা ওকে দেখা।

বন্দিতা। দেখাস অখন।

দীপ্তি। ওরে বাসরে! এখনও তবু ত হাকিমের গিন্নী হসনি হলে তখন ত একেবারে ফাঁসিরই হুকুম দিয়ে বসবি।

ছাযা। ফাঁসিটা যদিও মকুব করে জেল ত অব্যর্থ।

দীপ্তি। হাঁ ভাই, শেষে আমাদের কপালে জেল নাচছে?

ছায়া। আচ্ছা মুখখানা তোর অমন হাঁড়ি কেন?

দীপ্তি। কিরে, কথা নেই কেন মুখে? তোর মুখে যে হাসির ফোয়ারা ছোটে?

ছায়া। ফল্গু এখন অন্তঃসলিলা।

দীপ্তি। ফল্গুর বালি খুঁড়ে এই দেখ কি রস প্রবাহ আমরা তুলে এনেছি? [খাতার মধ্য থেকে একটি হাতে-আঁকা পেন্সিল স্কেচ বের করে] বল আগে কখন দেখেছিস?

[বন্দিতা ছবিটি আপনার হাতে নিয়ে দেখতে লাগল]

দীপ্তি। কিরে দেখেই যে তন্ময়।

বন্দিতা। কে এঁকেছে?

দীপ্তি। গত বছর তোর বর ওকালতি ছেড়ে যখন জজিয়তি নেয় তখন বারের বন্ধুরা ওঁকে উপহার দেবার জন্যে আঁকিয়েছিল। দেখছিস্ মুখে একটা ফিডিং বটল্, তলায় লেখা 'খোকা হাকিম'? আসল মানুষটার সঙ্গে নিবিড় ভাবে নাই বা হল পরিচয়, তাঁকে নিখুঁত করে চিনিয়ে দিচ্ছে এই পেন্সিল স্কেচ্। দেখ ভাল করে, পরিচয় করে নে।

[বন্দিতা উদাসীন ভাবে ছবিটা ফেরত দিল।]

দীপ্তি। কিরে ছবি দেখে মানুষটার পরিচয় পাওয়া গেল না?

বন্দিতা। [একটু বিষন্ন হাসি হেসে] না।

দীপ্তি। তোর বর যে একটি শিল্পীর-আঁকা তোর ছবি দেখেই

তোকে পছন্দ করেন, তারপর আর আসল মানুষটাকে দেখতেও রাজী হলেন না, বললেন আসল চোখ ছলনা করে শিল্পীর তুলি করে না।

বন্দিতা। সে ছবি কে এঁকেছেন জানিস ?

দীপ্তি। না।

নন্দিতা। বাবা।

দীপ্তি। [শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্তকর মাথায় ঠেকিয়ে] তাই বল !

[পিছনের পরদা ঠেলে হল ঘরে প্রবেশ করলেন নন্দিতার মা ভবতারিণী। মাকে দেখেই তিন জনেই উঠে দাঁড়াল। দীপ্তি ও ছায়া মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।]

বন্দিতা। মা এরা সব কলেজ থেকেই এসেছে ।

ভবতারিণী। তুমি ওদের নিয়ে বস।

নন্দিতা। [মাকে আসিয়ে যেতে দেখে] তুমি কোথা যাচ্ছ ?

ভবতারিণী। আর কতকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারি ?

বন্দিতা। তুমি কোথায় খুঁজতে যাবে ?

দীপ্তি। কোথাও কিছু গোল বেধেছে কি, মা ?

বন্দিতা। বাবা সেই কোন্ ভোরে না খেয়ে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

ছায়া। সে কি, কোথায় গেছেন ?

ভবতারিণী। কে জানে বাছা কিছুই বলে যান নি।

ছায়া। তাই বন্দিতার মুখখানি অমন শুকনো শুকনো।

ভবতারিণী। আজ শুভদিনে মেয়েটা চোখের জল ফেলছে।

দীপ্তি। বাড়ীতে ঢুকেই মনে হয়েছে কেমন একটা থমথমে ভাব।

[বন্দিতা মুখে হাত ঢাকা দিয়ে কেঁদে উঠল।]

ছায়া। এই, কি ছেলেমানুষী হচ্ছে,...চল উঠে চল ! [তারও চোখে জল।]

ভবতারিণী। তোমরা ওকে নিয়ে যাও,...চোখে মুখে জল দিয়ে

সাজাতে বস। গোধূলি লগ্নে বিয়ে, বর আসবার সময় হয়ে গেল ; নিমন্ত্রিতেরা এখনই ভিড করে আসতে শুরু করবেন।

বন্দিতা। বাবার জন্যে তুমি ঘরবার করবে, আর আমি সাজতে বসব।· ঐ ত মামা এলেন।

[বন্দিতার মামা সারদাপ্রসাদ প্রবেশ করলেন। বেশভূষায় আকৃতিতে একটা আভিজাত্যের ছাপ।]

সারদা। [আদর করে বন্দিতার থুতনি ধরে] কি মামণি, এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছ ? বর যে এসে পড়ল বলে।

ভবতারিণী। খবর কিছু পেলে দাদা ?

সারদা। [ছোট বোনটির কানের কাছে মুখটি রেখে] গল্প শুনে থাকবি, আনমনা এক বর বিয়ের রাতে বন্ধুর বাড়ীতে দাবা নিয়ে মশগুল, আর এদিকে বরযাত্রীরা দুনিয়া তোলপাড করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোমার বরের কাণ্ডটিও ঠিক তাই।

দীপ্তি। দাবা খেলছেন ?

বন্দিতা। কোথায় মামা ?

ভবতারিণী। দেখা হয়েছে ?

সারদা। অচমকা।

বন্দিতা। কোথায় ?

সারদা। তাঁর উকিল বাড়ীর সদরে নিশ্চুপ বসে আছেন।

ভবতারিণী। সেই ভোর থেকে ?

সারদা। ভোর থেকে ভবঘুরের মত কোথা কোথা ঘুরেছে কিছুই ত বললে না।

ভবতারিণী। সঙ্গে করে নিয়ে এলে না ?

সারদা। কচি খোকা! কোলে করে নিয়ে আসব ? না হাত ধরে টানাটানি করে রাস্তার লোক জড করব ? অনেক অনুনয় বিনয় করে বলে এসেছি ; গাড়ীখানাও রেখে এসেছি, সোজা বাড়ী ফেরবার জন্যে ; আর নিজে উঠি কি পডি করে ছুটে আসছি খবরটি তোমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।

ভবতারিণী। নিমন্ত্রণ করবার হয়ত অনেক ঘর বাকী, তাই হয়ত সকাল থেকে নিমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছেন। জান ত দাদা, কেমন ভোলা মন!

সারদা। এদিকে বিয়ে যে পণ্ড হয়, তার হুঁস নেই?

বন্দিতা। চল, মা লক্ষীটি, বাবার খবর ত' পেলে, তোমায় কিছু খাইয়ে আনি।

সারদা। এখনও পর্যন্ত মুখে জল দিসনি?

ভবতারিণী। তাঁর যে এখনও খাওয়া হয়নি?

সারদা। হুঁ! সেই পরভুলানি মানুষ। তাকে যে পায় না খাইয়ে ছাড়ে না কি? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে একেবারে বরযাত্রী সেজে নিমন্ত্রণ খেতে আসবে।

বন্দিতা। তখন আপনিও খুব খাতির দেখাবেন— এই যে আসুন বসতে আজ্ঞা হয়।

ভবতারিণী। [হেসে ফেলে] এতক্ষণে মেয়ের মুখে হাসি ফুটল।

[বন্দিতা এক হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে, আর একটি হাত বান্ধবীদের দিকে আগিয়ে দিয়ে··]

বন্দিতা। এস সব ভিতরে।

[সারদাপ্রসাদ ব্যতীত আর সকলে ভিতরে চলে গেলেন। ঘড়িতে ঠং ক'রে বেজে উঠল]

সারদা। ঐ দেখ সাড়ে চারটে বাজল। আরে সাড়ে পাঁচটায় যে লগ্ন! এখনও কারো টিকির পর্যন্ত দেখা নেই; শেষে যখন সব হুড় হুড় ক'রে একসঙ্গে এসে পড়বে তখন তুমি শালা মর। ঐ ত, কে আসে?···বরযাত্রীরা আসতে শুরু করল না কি! অমন হাঘরের মত চেহারা বরযাত্রী ছাড়া আর কার হবে।

[তিনজন ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেলিফ, একজন পেয়াদা আর একজন নিশানদার। সামনের বড আয়নাটিতে তাঁদের বেশ-ভূষা ও চেহারা দেখে সারদাপ্রসাদের রুচিতে বাধল; মুখখানি বিকৃত হল। তাঁদের দিকে মুখ না ফিরিয়ে আয়নায় পড়া ছায়ার দিকে চেয়ে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন।]

সারদা। এই যে সময় থাকতেই এসে পড়েছেন? এক একটা আসন দখল করে বসে যান, একটু আরাম করুন।

বেলিফ। আমি কোর্টের বেলিফ।

সারদা। তা বেশত, কে আপনার বংশ পরিচয় চাইছে? একটু আগেই এসে পড়েছেন, বসুন একটু। এদেশের বরযাত্রীদের হ্যাংলাপনা চিরপ্রসিদ্ধ।

[শেষের কথাটি তাঁর স্বগত উক্তি; কিন্তু বিরক্তিহেতু অসাবধানে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল একটু জোরেই]

বেলিফ। কি মশায়, বেলিফ দেখেই প্রলাপ শুরু করলেন?

নিশানদার। এ শালা বোধ হয় সাবটেনান্ট; ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় করতে হবে।

সারদা। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] কি বলছেন?

বেলিফ। আমি এসেছি পজেসান নিতে।

সারদা। পজেসান? [হাল্কা ভাবে হো হো করে হেসে উঠে] বুঝেছি, বুঝেছি, আমরা তৈরী হয়েই আছি।

বেলিফ। খুব ভাল কথা। তৈরী হয়েই আছেন? তবে সহজেই কাজ মিটিয়ে যাই।

সারদা। ডান হাতের কাজ ত?

নিশানদার। শালা খলিফা!

বেলিফ। ধড়িবাজ!

সারদা। আর সব এসে পৌঁছুক।

বেলিফ। কারো আসবার অপেক্ষা করব না। মানে মানে আপনাদের মালঝাল আসবাবপত্র সব নিয়ে এ বাড়ী খালি করে দিন, আমি পজেসান দেব আর ইনি বাড়ীতে তালা দিয়ে যাবেন।

সারদা। আপনারা কোন দেশী মশায়? এ আবার কোন দেশী ঠাট্টা?

নিশানদার। ন্যাকামি রাখুন। এই বাড়ীর ওপর ইজেক্ট-

মেণ্ট্ ডিগ্রী হয়ে গেছে, আমি কোর্ট থেকে বেলিফ নিয়ে এসেছি পজেসান নিতে।

সারদা। [কিছুক্ষণ বেলিফ ও নিশানদারের মুখের দিকে চেয়ে থেকে] দেখুন, এটা ইজেক্ট্মেণ্ট ডিগ্রীর বাড়ী নয়, এটা বিয়েবাড়ী, আপনাদের বাড়ী ভুল হয়েছে।

বেলিফ। ইনি ডিগ্রীদারের সরকার, যে বাড়ীর ওপর ডিগ্রী ইনি চেনাতে এসেছেন।

নিশানদার। [মুখ ভেংচাইয়া] এঃ বাড়ী ভুল হ'য়েছে! হাত ধরে হিড় হিড় ক'রে সব টেনে বের কবে ভুল ভাঙ্গাচ্ছি!

বেলিফ। দেখুন সহজে অভদ্রতা আমরা করি না। তৈরী হ'য়ে আছেন তা ত বললেন; মেয়েদের ডাকুন, সুড় সুড করে বের হ'য়ে যান।

নিশানদার। মালপত্র আসবাবগুলি আমরাই লোকদিয়ে বের করে আপাততঃ রাস্তার ফুটপাথে রাখছি। পরে আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন।

সারদা। দেখুন আমি এদের আত্মীয়। আজ এ বাড়ীতে একটা বিয়ে সেই উপলক্ষে এসেছি। মালিক ত এখন বাড়ীতে নেই।

বেলিফ। বাড়ীতে বিয়ে অথচ মালিকের নিমন্ত্রণ হয়নি?

সারদা। আর বলেন কেন মশায়, যাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

বেলিফ। যাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি খাচ্ছেন হাওয়া, আর উড়ে এসে জুড়ে বসে আপ নি খাচ্ছেন পোলাও? এ ত সুন্দর ব্যবস্থা!

নিশানদার। এখনই খুব ভাল করে পোলাও খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।

বেলিফ। আর কথা বাড়াবেন না, কুলিদের ডাকুন এক একটি করে মাল বের করুক। [নিশানদার বাহিরে গেল।]

সারদা। বিয়ের কথাটা বিশ্বাস হল না?

বেলিফ। দেখুন অনেক কাল এই কাজ করে চুল পাকিয়ে

ফেললুম। পাজেসান দিতে গিয়ে জন্ম মৃত্যুর অভিনয় ত কত দেখলুম; কিন্তু ঘটা করে বিয়ের আয়োজন এটা একটু নভেল। বিশ্বাস নয়, তারিফ করছি!

সারদা। কাকে?

বেলিফ। বিয়ে যখন হ'চ্ছে বর একটা আছে নিশ্চয়ই?

সারদা। বর ত এসে পড়ল বলে, গোধূলি লগ্নে যে বিয়ে।

বেলিফ। পাড়ার কোন রক্‌বাজ ছোকরাকে বর সাজিয়ে আনছেন ত? তা তিনি এসে পড়বার আগেই নেপথ্য থেকে তাকেই তারিফ করে আমরা কাজ হাসিল করে চলে যেতে চাই।

[চারজন কুলি নিয়ে নিশানদারের প্রবেশ।]

পেয়াদা। [কুলিদিগকে] এই সব মাল, একঠো একঠো করকে বাহার নিকালো।

বেলিফ। [পেয়াদাকে] তুম বাহার খাড়া হো যাও। কিসিকো ভিতর ঘুস্‌নে মাৎ দেও।

পেয়াদা। ঠিক হ্যায়। [পেয়াদা বাহির হইয়া গেল।]

বেলিফ। [নিশানদারকে] একটি একটি করে মাল বের করে ফুটপাথের উপর রাখুন। [কুলিদিগকে] খাড়া হোকর দেখতে কেয়া? জলদি নিকালো সব মাল। [সারদাকে] মালগুলি এখন ফুটপাথের ওপরই আপনাদের দায়িত্বে রেখে দেওয়া হবে। ভাল চান ত বাইরে গিয়ে ওগুলো আগলে রাখুন।

[চারজন কুলি একটি বড সোফা তুলে ধরে বাহিরে নিয়ে যেতে লাগল]

বেলিফ। [নিশানদারকে] যতটা পারেন দেখুন, ফার্ণিচারগুলি ড্যামেজড না হয়।

নিশানদার। ভাল মুখে পজেসান ছেড়ে দিলে আমরাও ভদ্রতা দেখাব। তা না হলে [সারদাকে] সব ভেঙ্গে চুরে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।

সারদা। আরে এরা যে সত্যিই সব বের করে!

[সারদাপ্রসাদ এতক্ষণ বসে মাথা হেঁট করে চিন্তা করছিলেন, মুখ তুলে কুলিদের সোফাটি বের করতে দেখে ছুটে গিয়ে বাধা দিলেন। নিশানদার তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। তিনি ফিরে এসে ভিতরে যাবার দরজার সামনের পরদার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন...]

সারদা। [বেলিফকে] সারাদিন উপবাসের পর মেয়েটি সবে হয়ত কিছু মুখে দিতে বসেছে, তাকে এখন ডাকি কেমন করে ?

বেলিফ। আর এখানে রান্না খাওয়ার পাট চলবে না। সামনের ঐ রেস্তোরায় নিয়ে গিয়ে মেয়েদের সবাইকে বসান। আপনাদের মালগুলোও সব আগলান হবে : দেখতেও সভ্য হবে, আমাদের কাজও হালকা হবে।

সারদা। [বেলিফের হাত দুটি ধরে] মশায়, আমি অতি সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র ; আমাদের বংশে কেউ কখন কারো কাছে মাথা হেঁট করেন নি ; আমি আপনার হাত দুটি ধরে বলছি, [বেলিফের যুগ্ম করে আপনার মাথাটি ঠেকাইয়া] আজকের মত আমাদের ইজ্জত বাঁচান। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, কাল বর বধূ বিদায় দিয়ে আমি আমার ভগ্নী ভগ্নীপতিকে আমার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুলব ; এ বাড়ীর দখল বাড়ীওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে যাব।

[বেলিফ নিজের হাতদুটি অবজ্ঞাভরে টেনে নিয়ে সারদাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।]

বেলিফ। এতক্ষণে বোধহয় ব্যাপারটা মাথায় নিয়েছেন। হো হো করে হেসেই ত সব উড়িয়ে দিতে চাইছিলেন। এতক্ষণে মাথায় গেছে ব্যাপারটা সিরিয়াস, হেসে উড়িয়ে দেবার নয়।

সারদা। আমি বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস, তা না হলে বাড়ীর কর্তাটি পালিয়ে গিয়ে উকিল বাড়ী লুকিয়ে বসে থাকত না।

নিশানদার। আপনাদের উকিলবাবুও ছ্যাচড়ামি করতে কসুর করেন নি ; শেষে হল এই ! [বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল]

সারদা। মশায়, আপনার পাওনা কত ? নিন্ আমার কাছ থেকে।

নিশানদার। আপনাকে কতবার বলব, এ পাওনার ডিগ্রী নয়, এ পজেসানের ডিগ্রী।

সারদা। সে ত আপনার বাবুর। আপনার কি হলে হয় তাই বলুন।

বেলিফ। এইবার বেসুরো গাইছে, তাও আবার আমার সামনে। জানেন ?

সারদা। খুব জানি আমাদের কপুরুষ ধবে জমিদারি ; আপনাদের সঙ্গে কত পুরুষেব জানাজানি।

বেলিক। ন্যাকামি ছেড়ে এবার ধবলেন বাতুলতা ?

সারদা। বাতুলতা ? সে ত কেবল মাত্রাব প্রশ্ন। কেউবা দশটাকায় খুশী, কারো কাছে সেটা বাতুলতা। যাঁর কাছে দশ হাজার টাকাও বাতুলতা মাত্র, দশ লাখে তিনিও গলে জল।

বেলিফ। লাখ লাখ টাকা দেখাচ্ছেন যে !

নিশানদার। মাস গেলে বাড়ী ভাড়ার টাকা যাব জোটে না মুখে লাখ পঞ্চাশ সে ত মাববেই।

সারদা। লাখ পঞ্চাশ দেখাচ্ছি না, আমি শুধু আপনাদের বাজার দর যাচাই করছি।

বেলিফ। এই দেখুন আমাব বাজার দব।

[বেলিফ একটি মূল্যবান সুদৃশ্য কাঁচের ফুলদানি ছুঁডে ফেলে দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল]

নিকালো আভি নিকালো সব মাল, নিকালো।

[ফুলদানি ভাঙ্গাব শব্দে ও বেলিফের চিৎকারে পরদা ঠেলে সামনে এসে দাঁড়াল বন্দিতা ; তার অঙ্গে বেশভূষা অর্ধসমাপ্ত.]

বন্দিতা। এ সব কি হচ্ছে মামা ?

সারদা। তোমার শ্বশুর বাড়ী পাঠান হচ্ছে।

বন্দিতা। আপনার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেল ?

সারদা। এই মেয়ে, এরই বিয়ে। এ আপনারও মেয়ে। এর মুখের দিকে চেয়ে আজকের মত আমাদের ইজ্জত বাঁচান।

নিশানদার। খাসা মালখানি যোগাড় করেছেন ত ?

[বন্দিতা মুখে হাত চাপা দিয়ে পর্দার ভেতরে চলে গেল ; পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল দীপ্তি ও ছায়া, তারা এগিয়ে এল ।]

দীপ্তি । কেন ফার্নিচারগুলোকে এমন লণ্ডভণ্ড করা হচ্ছে ?

সারদা । গলায় গামছা দিয়ে এরা নিয়ে যাচ্ছে ।

ছায়া । এরা কারা ?

সারদা । কোর্টের লোক ।

ছায়া । বর পক্ষের লোক ?

সারদা । নারে বাছা । এরা এসেছে বিয়ে পণ্ড করে দিতে আর গলা টিপে আমাদের সব এক্ষুনিই বাড়ী ছাড়া করতে ।

ছায়া । কেন ?

সারদা । কেন এদের শুধোও ।

ছায়া । কে তোমরা ?

বেলিফ । কোর্টের হুকুমে এসেছি, আমি কোর্টের বেলিফ ।

দীপ্তি । এ ফুলদানি ভাঙ্গলে কে ?

বেলিফ । আমি ।

দীপ্তি । শয়তান ! বেরও, বেরও এখনি এখান থেকে ।

নিশানদার । কে কাকে বের করে ?

দীপ্তি । এখনই দেখাচ্ছি । ছায়া যাওত আমাদের ইউনিয়ন অফিসে, এখনই সকলকে পাবে ।

ছায়া । ঠিক । [ছায়া চলে গেল ।]

দীপ্তি । আমি এই দরজা আগলে দাঁড়ালুম ।

সারদা । আমি এদের অনেক হাতে পায়ে ধরেছি ।

দীপ্তি । হাতে পায়ে ধরার যুগ চলে গেছে মামাবাবু, কলেজ ছুটি হচ্ছে, ছায়া এখনই তাদের নিয়ে এল বলে । আপনি ভিতরে যান কনেকে আর কনের মাকে সামলান ।

নিশানদার । ছুঁড়িটা শাসাচ্ছে না কি ?

দীপ্তি । মামাবাবু, যান না ভিতরে ।

সারদা। তোমাকে একলা রেখে ?

দীপ্তি। একা আমি বহু হব; আপনি ভেতরে যান।

[একরকম জোর করেই তাঁকে পর্দার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল।]

বেলিফ। ফিরে চলুন মশায়, বিনা পুলিস সাহায্যে আর আমি পারব না। লেডি পুলিসের জন্যেও দরখাস্ত করতে হবে।

দীপ্তি। [কুলীদিগকে] কেয়া তামাসা দেখতা, যাও হিঁয়াসে।

একজন কুলী। হামলোগ কো মিটা দীজিয়ে চলা যাতা।

দীপ্তি। যাও ভাগো।

[দীপ্তি অর্গানটির উপর রাখা আপনার ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে দুটি টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিল। কুলীরা টাকা নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হ'তে—]

নিশানদার। দাঁড়ারে বাপু, আমি তোদের যেতে বলছি।

বেলিফ। বলুন, বলুন কি করতে চান ?

নিশানদার। মালগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চটপট্ পজেসান্ দিন। ছুঁড়িটাকে আমিই হাত ধরে টেনে বাড়ি থেকে বের করছি।

বেলিফ। [দীপ্তিকে] আপনি পজেসানে বাধা দিচ্ছেন ? আপনার নাম কি ?

দীপ্তি। আমার নাম কর্তাদের হাড়ে হাড়ে জানা, এ নামের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়নি, আজ হবে।

বেলিফ। নাম বলতে অস্বীকার। আপনি এখানে কেন এসেছেন ?

দীপ্তি। বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে।

নিশানদার। কিসের বিয়ে ? সেবার এক বাড়ীতে পজেসান্ নিতে গিয়ে দেখি একটা ঘরে একটা মেয়েছেলেকে কাপড়ের বস্তা চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে বলছে ওগো আমার পোয়াতি মেয়েকে আঁতুড় ঘর থেকে টেনে বের করে দিচ্ছে। আমি গিয়ে কাপড়-চোপড় সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে মেয়েটা চোঁচা ছুটে পালিয়ে গেল, তোমাদের জাতটাকে আমি চিনি।

দীপ্তি। খবরদার, ইতরের মত কথা বলবে না।

বেলিফ। এমনি মুখে মুখে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে হবে নাকি? চলে চলুন। পুলিস হেলপ্ না নিয়ে আজকাল কোনক্ষেত্রেই পজেসান দেওয়া সম্ভব হয় না।

[বঙ্কিমশ্যাম বাবুর প্রবেশ]

বঙ্কিম। না, না, পুলিসের দরকার হবে না।

বেলিফ। উকিলবাবু আপনি! স্টে অর্ডার পেয়েছেন নাকি?

বঙ্কিম। স্টে অর্ডার নয়, এনেছি কিছু টাকা।

বেলিফ। তাতে অর্ডার কি হবে?

বঙ্কিম। হতেই হবে। আমি এসেছি কি করতে?

বেলিফ। আমাকে শুধু লজ্জা দিতে। আপনি আইনে পণ্ডিত আপনাকে আর আমি কি বোঝাব?

বঙ্কিম। আপনার সঙ্গে আইনের কথা কইতে আসিনি। খালি হাতেও আসিনি। আমি এনেছি টাকা।

বেলিফ। কার জন্যে?

বঙ্কিম। প্রথমতঃ ডিগ্রীদারের জন্যে। হাকিমের হুকুম মত সমস্ত টাকা আপনার হাতে জমা দিয়েও বেশ কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকবে, তাতে আজকের পজেসান্ নিতে আসার সমস্ত খরচ মিটিয়ে দিয়েও বেশ কিছু বাঁচবে বাড়ীওয়ালার সরকার আর আপনার নমস্কারীর জন্যে।

বেলিফ। কোন জুনিয়ার উকিল এ কথা বললে আমার কাছে তিরস্কার পেত। আপনি বারের মাথা, আপনি আমার মাথা হেঁট করালেন।

বঙ্কিম। মাথা হেঁট আমার হচ্ছে না?

বেলিফ। হওয়াই উচিত।

বঙ্কিম। ছোকরা বয়সেও আমি বেলিফদের ঘরে ঢুকতে ঘৃণাবোধ করতুম। আমার মরবার বয়সে আজ এ মরণ দশা কেন হল?

বেলিফ। আপনাকে এখানে আসতে দেখে আমিও লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছি।

বঙ্কিম। লজ্জার মাথা খেয়ে তবুও আসতে হল।

বেলিফ। আপনার আপনার-লোক এঁরা?

বঙ্কিম। মক্কেল মাত্রেই আমার একান্ত আপনার।

বেলিফ। মক্কেল ত আপনার অসংখ্য।

বঙ্কিম। তাঁদের মধ্যে ইনি স্বতন্ত্র একজন; ইনি একজন সাধক।

বেলিফ। সাধক? তান্ত্রিক?

বঙ্কিম। তন্ত্র নয়। কলা।

বেলিফ। কলা? কোন জাতের?

বঙ্কিম। যে কলা আপনারা পাঁচজনকে দেখিয়ে কাজ হাসিল করে বেড়ান সে কলা নয় [সামনের দরজার পর্দা সরিয়ে] এই দেখুন।

বেলিফ। এ যে ছবির গুদাম! এই উজাড় করে আমাকে পজেসান দিতে হবে?

বঙ্কিম। গুদাম নয় চিত্রশালা। ওঁর সাধনার ক্ষেত্র।

বেলিফ। আর্টিস্ট? তাই বলুন।

বঙ্কিম। তাতে কিছু বলা হল না। ঐখানে তুলিহাতে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত যখন তিনি দিনের পর দিন সাধনা করেন তখন সমস্ত সংসারের চিন্তা ভেসে যায়; বাড়ীভাড়া জমে ওঠে; বাড়ীওয়ালা কোর্টে একতরফা ডিগ্রী করিয়ে নেয়।

বেলিফ। চমৎকার! এমন লোকের শহরে বাস করা কেন?

বঙ্কিম। এঁরা কি যাবেন বনে আর বন্য পশুরা শহরে এসে বাস করবে?

বেলিফ। বন্য পশুদের যে ক্ষুধা সেই ক্ষুধা শহরবাসীদেরও।

বঙ্কিম। একবার ওঁকে দিয়ে আমার মায়ের একখানি ছবি আঁকাই। প্রতিদিন সকালে মাকে প্রণাম করতে গিয়ে যে শিল্পী মায়ের মুখখানিকে চিরজীবন্ত করে রেখেছেন আনমনা তাঁকেও একটা

প্রণাম করে বসি। যে শিল্পীর কাছে প্রতিদিন প্রভাতে আমি মাথা হেঁট করে এসেছি, আজ তাঁরি জন্যে একজন কোর্টের বেলিফের কাছে মাথা হেঁট করতে আমার একটুও দ্বিধা হচ্ছে না।

বেলিফ। হাকিমদের এড়িয়ে আমার কাছে কেন আপনি মাথা হেঁট করতে আসবেন?

বঙ্কিম। একটা জারী বন্ধের দরখাস্ত মঞ্জুর করান আমার কাছে ছেলে খেলা। কিন্তু আজ কেন জানিনা হাকিম আমাকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। শেষে হাকিম যেন আমাকেই জব্দ করবার জন্যে হুকুম দিলেন আজই বেলা ছুটোর মধ্যে সমস্ত বাকী ভাড়া আর খরচের টাকা জমা দিলে দরখাস্তের শুনানী এক সপ্তাহের জন্যে মুলতুবী থাকবে। ঠিক ছুটোর পর এজলাসে বসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন আর একটুখানি মুচকে হেসে আমার দরখাস্ত খারিজ করে দিলেন।

বেলিফ। বিয়ের কথা সত্যি?

বঙ্কিম। হাকিমকেই বিশ্বাস করাতে পারলুম না, আপনাকে বিশ্বাস করাব কেমন করে?

বেলিফ। টাকার যোগাড় ছিল?

বঙ্কিম। টাকার যোগাড় হল কখন? কোর্টের পর বাড়ী ফিরে দেখি তিনি সমস্ত টাকা নিয়ে আমার বাড়ীর সদর দরজার সামনে বসে আছেন।

বেলিফ। আশ্চর্য মানুষ ত! কোর্টে না গিয়ে আপনার বাড়ী গিয়ে বসে আছেন, তাও কাছারি বন্ধ হবার পর!

বঙ্কিম। তবে শুনুন। কদিন ধরে একটি ধনীগৃহে তিনি একখানি ছবি আঁকছিলেন। চিত্রখানি শেষ হতে একটু বাকী। সেই বাকীটুকু শেষ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি গেছলেন আজ ঘুম থেকে উঠেই ধনীর গৃহে কিছু টাকা চাইতে। ধনী বললেন, বেশ ত একটুখানি তুলির টান বাকী আছে সেইটুকু সেরে দিয়ে সব টাকা নিয়ে যান। তাই তাই, তুলি হাতে তিনি চিত্রের সামনে বসে

গেলেন। আশ্চর্য মানুষটি, তুলি হাতে তিনি চিত্রের সামনে বসে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানস্থ। ঘর বন্ধ করে সকাল সাতটা থেকে বৈকাল তিনটা পর্যন্ত তিনি তুলি হাতে ছবির সামনে বসে রইলেন। ভুলে গেলেন নিজের নাওয়া খাওয়া, ভুলে গেলেন মেয়ের বিয়ের কথা, ভুলে গেলেন টাকা নিয়ে আমার বাড়ী যাবার কথা, ভুলে গেলেন আজ বাড়ীওয়ালা তাঁর বাড়ী দখল নিতে যাবেন, ভুলে গেলেন ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। ছবি শেষ করে ঘর খুলে তিনি যখন বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন তখন প্রথম ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল, তিনটে বেজে গেছে। ছবি দেখে ছবির মালিক লাফিয়ে উঠলেন; পুরো টাকা দিয়ে শিল্পীকে বিদায় করলেন।

বেলিফ। আশ্চর্য! এমন মানুষও আজকাল দেখা যায়? টাকা নিয়ে কোথায় তাঁকে যেতে বলেছিলেন?

বঙ্কিম। টাকা নিয়ে সকাল আটটায় আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে বলেছিলুম। তাই টাকা নিয়ে শিল্পী আমারই বাড়ীতে হাজিরা দিলেন, কিন্তু তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে। গাড়ী থেকে নেমেই আমার ফটকের সামনে তাঁকে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্যমত শান্ত দেখলুম মানুষটার মুখ! সারাদিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই তবু মুখখানি প্রশান্ত নির্বিকার! সেই মুখখানিতে কিসের যে ইঙ্গিত দেখতে পেলুম, কে যেন সোজা আমাকে এখানে নিয়ে এল!

বেলিফ। এযে গল্প কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

বঙ্কিম। শিল্পীর হাত থেকে টাকা কটি নিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে সোজা এখানে।

বেলিফ। তাঁকে কোথায় রেখে এলেন?

বঙ্কিম। তখন আর আমার অন্য কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। জানি বাড়ীওয়ালার জেদ; গাড়ী ছুটিয়ে এসেও রেসে আপনার কাছে হেরে গেছি।

বেলিফ! এখন! [একটু হাসলেন।]

বঙ্কিম। আপনার হাত। [তিনিও হাসলেন।]

বেলিফ। আইনের কথা বলুন, আমার কি হাত ?

বঙ্কিম। যে টাকা আজ ছটোর পূর্বে কোর্টে জমা দেবার কথা, সেই সমস্ত টাকা আমি আপনার কাছে জমা দিচ্ছি। কাল সকালে কোর্ট বসবার সঙ্গে সঙ্গে বিলম্বে টাকা জমা দেবার অপরাধ আমি মার্জনা করিয়ে নেব। আর আমার কাছ থেকে টাকা জমা নেওয়া, পরওয়ানা জারী না করে ফেরত চলে যাওয়া—আপনার এইসব কাজ আমি হাকিমের কাছ থেকে বিধিসঙ্গত করিয়ে দেব। যদি না পারি পুরা টাকা বাড়ীওয়ালা পেলেন, উপরন্তু কাল সূর্যাস্তের পূর্বেই এ বাড়ীর দখল আমি নিজে এসে বাড়ীওয়ালাকে দিয়ে যাব। আমার ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি আপনি আপনার পরওয়ানায় লিখে নিন, আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি।

বেলিফ। [নিশানদারকে] শুনলেন ত' ?

নিশানদার। আমি রাজী নই, সে কাল কালেই পাবে।

[সহসা রাস্তায় বহুলোকের চিৎকার শোনা গেল। অনুমানে বোঝা গেল বাড়ীর সামনে বহুলোক জমায়েত হয়েছে। বহু কণ্ঠের সমবেত চিৎকার শোনা গেল,—"বাড়ীওয়ালার অত্যাচার সইব না।" দীপ্তি এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে বেলিফ ও বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন শুনছিল, বাহিরের কোলাহল শুনে সে হাততালি দিয়ে উঠল।]

দীপ্তি। ঐত ওরা এসে গেছে, আর ভয় নেই।

নিশানদার। [ভেংচে] মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে !

দীপ্তি। চলুন না দেখিয়ে আনি।

বঙ্কিম। কিসের গোলমাল ?

বেলিফ। পাড়ার ছেলেদের ডেকে এনেছে; তারাই হল্লা করছে।

বঙ্কিম। হল্লা হবে কেন ? আসুন ত' গিয়ে দেখি ?

বেলিফ। মাথাটা ভাঙতে চান নাকি ?

বঙ্কিম। ঢেউয়ের ধাক্কায় আছাড় খায় তারা যারা তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র স্নান সারতে চায়, আগাতে সাহস করে না। আর আমোদ

পায় তারা যারা ঢেউয়ের মাথার ওপর লাফিয়ে উঠতে পারে। আসুন, আসুন।

[বঙ্কিমবাবু ও পিছনে পিছনে বেলিফ চলে গেলেন।]

দীপ্তি। নিশানদারকে] মাথা যদি কারো ভাঙে সে আপনার।

[নেপথ্যে "বর এসেছে" "বর এসেছে" শুনে দীপ্তি তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল।]

নিশানদার। [কুলীদেরকে] চলরে বাপু একটু তফাতে গিয়ে দেখা যাক।

[কুলীদের সঙ্গে করে নিয়ে নিশানদার চলে গেল।]

[এক সুবেশ সুন্দরকান্তি যুবক নাম শান্তনু তাঁকে সঙ্গে করে প্রবেশ করলো দীপ্তি।]

দীপ্তি। মামাবাবু বর এসেছে, বর এসেছে।

[সারদাপ্রসাদ প্রবেশ করলেন।]

সারদা। কৈ? কৈ? এই যে! এস এস বাবাজী। বসাও বরকে।

দীপ্তি। কোথায় বসাব?

[সেই কিছুটা লণ্ডভণ্ড করা হলঘরখানিতে বরের জন্য নির্দিষ্ট সাজান আসনটি ঠিক ছিল, সেইখানে বরকে হাত ধরে এনে সারদাপ্রসাদ বসালেন।]

সারদা। বসো বাবাজী। আর সব? বরকর্তা? বরযাত্রীরা?

দীপ্তি। এসে পড়ছেন।

সারদা। তাইত? এদিকে আমাদের যোগাড় কৈ?

দীপ্তি। আমি এখানটা দেখছি। আপনি ভিতরে যান সব যোগাড় করে ফেলুন।

সারদা। তাই মা তুমি বরকে দেখ, আমি ভিতরটা দেখি [বরকে] ইনি তোমার শ্যালিকা স্থানীয়া। তোমাকে এর জিম্মায় রেখে গেলুম। [দীপ্তিকে] তুমি মা বরের সঙ্গে হাসি মস্করা কর, আমি বিয়ের যোগাড় দেখি।

দীপ্তি। হাঁ তাই যান, এদিকের জন্যে কোন চিন্তা নেই আপনার, আমরা আছি, আমরা দেখছি।

সারদা। তাই দেখ। [সারদার প্রস্থান]

দীপ্তি। [বরকে] আজ আপনি এজলাসে বসেছিলেন?

শান্তনু। হাঁ।

দীপ্তি। আজও [শান্তনু কৌতুক হাসি হেসে ঘাড় নাড়ল] বিয়ের দিন বের হলেন কেউ নিষেধ করলেন না?

শান্তনু। করেছিলেন।

দীপ্তি। কে?

শান্তনু। মা।

দীপ্তি। মায়ের কথা আপনি শুনলেন না?

শান্তনু। না।

দীপ্তি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আপনারি মত একজন জজ ছিলেন, তিনি কখনো মায়ের কথার অবাধ্য হতেন না। বইয়ে পড়েছি।

শান্তনু। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের জজ।

দীপ্তি। আর আপনি।

শান্তনু। ছোট আদালতের জজ, আমি অনেক ছোট তাঁর কাছে।

দীপ্তি। ছোট আদালতের জজদের কি মায়ের কথা শুনতে নেই?

শান্তনু। আমি ত শুনিনি; মায়ের নিষেধ মানিনি। ফোঁটা তিলক মুছে জজের পোশাক পরে এজলাসে গিয়ে বসেছিলুম।

দীপ্তি। হাকিম যদি একদিন আদালতে না যায় কি হয়?

শান্তনু। সূর্য যদি একদিন না ওঠে কি হয়?

দীপ্তি। পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়।

শান্তনু। অন্ধকারে দুষ্কৃতিকারীরা সুযোগ পায়।

দীপ্তি। হাকিম আকাশের সূর্য না কি?

শান্তনু। আদালতে কেবল বাকচাতুরী। হাকিমের সুক্ষ্ম দৃষ্টি সূর্যের আলোর মত সেই কুজ্ঝটিকা ভেদ করে সত্যকে খুঁজে বের করে আর যার যা যথাযথ প্রাপ্য তাই পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে।

দীপ্তি। আজ এজলাসে বসে কাকে কি পাইয়ে দিলেন?

শান্তনু। আজ একজন অতি জবরদস্ত নাছোড়বান্দা উকিলের বাগ্মীতার কাল যবনিকা আমি ভেদ করতে পেরেছি। আমার গর্ববোধ হচ্ছে যে আজ আমি আদালতে যেতে পেরেছি আর একজনের নায্য প্রাপ্য অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করে আসতে পেরেছি।

দীপ্তি। আর কোনো হাকিম হ'লে?

শান্তনু। হয়ত তাঁর বাক্যবিন্যাসে বিভ্রান্ত হতেন।

দীপ্তি। আপনি সব বিষয়ে স্বতন্ত্র!

শান্তনু। কে বলে?

দীপ্তি। আমি ত বলছি।

শান্তনু। আপনি আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন?

দীপ্তি। অনেক কিছু।

শান্তনু। একটু কিছু বলুন না।

দীপ্তি। আপনি এক শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেই সেই মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠেন?

শান্তনু। আর কি জানেন?

দীপ্তি। আপনাকে তখন পাত্রীটিকে একবার চোখে দেখবার জন্যে পীড়াপীড়ি করা হয়, আপনি রাজী হননি।

শান্তনু। কেন রাজী হইনি তা জানেন?

দীপ্তি। আপনি বলেছিলেন, আসল মানুষটা চোখে মুখে কথা কয়, কিন্তু শিল্পীর সৃষ্টি খাঁটি সত্যটাকে ফুটিয়ে তোলে।

শান্তনু। আমি যদি স্বতন্ত্র হই, আপনি সবজান্তা?

দীপ্তি। চোক বুজে টোপ গিলেছেন, বিয়ে করবার পর যদি দেখেন শিল্পীর ছবি আপনাকে বিভ্রান্ত করেছে?

[শান্তনু একটিবার থমকে গিয়ে দীপ্তির দিকে চাইল।]

শান্তনু। [শান্তভাবে] কত লোকে ত আত্মহত্যা করে, সেও আমার পক্ষে আত্মহত্যা করার মত হবে।

দীপ্তি। [বরের মুখে হাত চাপা দিল] এই।......আর আপনার সঙ্গে কথা বলব না, এই মুখ ফিরিয়ে বসলুম। [মুখ ফিরিয়ে বসল]

শান্তনু। প্রত্যাখানে বিমর্ষ হয়ে গালে হাত দিয়ে এই আমিও অনুশোচনায় বসলুম।

[শান্তনু গালে হাত দিয়ে মাথা হেঁট করে নিচের দিকে চেয়ে বসল।]

[বঙ্কিমশ্যাম ও ছায়ার পুনঃ প্রবেশ]

বঙ্কিম। একেই বলে মব। ঠিক রুদ্রের মত। তাঁর রোষ, তাঁর তুষ্টি উভয়ই আকস্মিক।

ছায়া। মব কন্ট্রোল করবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আপনার দেখলুম।

বঙ্কিম। রুদ্রের তুষ্টিবিধান হয় একটিমাত্র চন্দন-বিল্বপত্রে।

ছায়া। আপনি কি পলিটিক্স্ করেন?

বঙ্কিম। সখের পলিটিক্স্ করলে ঐ জনতার হাতে মার খেতুম নয়ত লুকিয়ে আপনার প্রাণ বাঁচাতুম।

ছায়া। জনতার সামনে সাহস করে এগিয়ে যেতে—

বঙ্কিম। যে আত্মায় বিশ্বাসী কেবল সেইপারে।

[বেলিফ ও নিশানদারের পুনঃপ্রবেশ।]

ছায়া। এই যে এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলেন?

নিশানদার। তোমার দয়ায় পৈতৃক প্রাণটা বেঁচে গেছে দিদি।

ছায়া। দিদি বললে তাই এবারের মত মাপ করলুম; মা বললে তোমার ভণ্ডামি কেমন করে ছাড়াতে হয় দেখাতুম।

বঙ্কিম। [বেলিফকে] অতঃপর?

বেলিফ। [সামনে শান্তনুকে দেখে] একি। হুজুর যে এখানে।

বঙ্কিম। কে?

বেলিফ। ঐ দেখুন না সামনে বসে।

[শান্তনু তখন গালে হাত দিয়ে মাথা হেঁট করে বসে, ঘরে কে ঢুকল লক্ষ্য করলেন না। দীপ্তি বেলিফ আর নিশানদারকে আবার আসতে দেখে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।]

বঙ্কিম। [কাছে এসে] নমস্কার স্যার।

[শান্তনু মুখ তুলেই সামনে দেখল বঙ্কিমবাবুকে আর তার পিছনে বেলিফকে, দেখামাত্র রাগে লাফিয়ে উঠে ধমকে উঠলেন।]

শান্তনু। কি আশ্চর্য ! এখানেও আপনি আমার পেছু নিয়েছেন ?

বঙ্কিম। একটা অবস্থাবিপর্যয়ে পড়ে ।

শান্তনু। অবস্থা বিপর্যয় ত ঘটে পদে পদে, সেই সঙ্গে আপনাদের বুদ্ধিরও কি বিপর্যয় ঘটে ?

বঙ্কিম। ব্যাপারটা একটু না শোনালে আপনাকে···একটু শুনুন।

শান্তনু। আপনি কি চান আমি কোর্ট কাছারি মাথায় করে আপনাদের জন্যে ফেরি করে বেড়াব ? আর পিছন থেকে হেঁকে ডাকলেই মাথার ঝাঁকা নামিয়ে আপনাদের সঙ্গে ব্যাপার করতে বসব ?

দীপ্তি। কেন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করাতে গেলেন ?

বঙ্কিম। ধ্যান ?

দীপ্তি। দেখলেন না উনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন ?

বঙ্কিম। কার ধ্যান ?

দীপ্তি। বিয়ে করতে এসে বর কার ধ্যান করে সে কথা কি জানা নেই ?

বঙ্কিম। বর ? কে বর ?

দীপ্তি। গলায় বরমাল্য, বসে ছিলেন বরাসনে। আর কি করে বরকে চেনাতে হয় ?

বঙ্কিম। [দীপ্তিকে] ইনিই বর ? [শান্তনুকে] আপনারি বিয়ে আজ এখানে ?

বেলিফ। যাঃ বাবাঃ।

[কথাটা বেফাঁস মুখ দিয়ে বের হতেই সে জিভ কাটলো, কিন্তু শান্তনুর দৃষ্টি এড়ালো না।]

শান্তনু। [বেলিফকে] প্রলোভনে পড়ে আপনিও এসেছেন এর সঙ্গে ! আর নির্লজ্জের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন আমারি সামনে ?

বঙ্কিম। উনি এসেছেন আপনারি দেওয়া একটি ডিগ্রী জারী করতে। ডিগ্রীজারীর পরওয়ানা ওঁর হাতে।

শান্তনু। এখানে কেন? [তখনও সুর চড়া।]

বঙ্কিম। ডিগ্রী এই বাড়ীর উপর।

শান্তনু। কিসের ডিগ্রী?

বঙ্কিম। দখলের।

শান্তনু। দেনদার কে?

বঙ্কিম। পাত্রীর পিতা।

শান্তনু। [বেলিফকে] দেখি পরওয়ানা খানা।

বঙ্কিম। আপনারি দেওয়া ডিগ্রী।

[শান্তনু বেলিফের হাত থেকে পরওয়ানা খানি নিয়ে ভাল করে দেখে ফেরত দিলেন।]

বঙ্কিম। Unthinkable! but God is great!

শান্তনু। যদি অন্য কোন বেঞ্চের হত আমি মনে করতুম, সবটা জাল, আমাকে ঠাট্টা করবার জন্যে একটা নতুন রকমের প্রীতি-উপহার করা হয়েছে। কিন্তু [মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] এটা জাল নয়!

বঙ্কিম। এই ট্র্যাজেডি আমি রোধ করতে চেয়েছিলুম, আপনি হতে দিলেন না।

শান্তনু। এটা কি সেই ব্যাপার?

বঙ্কিম। বিয়ের কথা যতবার বলেছি, আপনি বিদ্রূপের হাসি হেসেছেন।

শান্তনু। এখন আমিই বিদ্রূপের পাত্র।

বঙ্কিম। একদা এক রাজার হাতে ছিল শব্দভেদী বাণ; রাজা মৃগশাবক ভ্রমে সেই বাণ ছুড়ে মারলেন এক অন্ধমুনির একমাত্র সন্তানের বুকে, পুত্রশোকে মুনি প্রাণ হারাল। তার পর সেই শোক ফিরে এল রাজার বুকে।

শান্তনু। আমারি দেওয়া ডিগ্রী ছুটে এসেছে আমাকেই উচ্ছেদ করতে ?

বঙ্কিম। এ আমারি অক্ষমতা! শুধু বকেই মরলুম সত্যটাকে আপনার চোখের সামনে খুলে ধরতে পারলুম না।

শান্তনু। আপনার দীর্ঘস্থায়ী বক্তৃতায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলুম, কান দিয়ে সব কথা শুনিনি।

বঙ্কিম। তখন মন ছিল অন্যত্র।

বেলিফ। তখন কেন আপনিই খুলে বললেন না, হুজুর—আপনারি আজ সেখানে বিয়ে ?

শান্তনু। পরওয়ানা হাতে নিয়ে আপনি কি এখানে তামাসা দেখতে এসেছেন ?

বেলিফ। আমি ত স্যার! ···আমি ত স্যাব।

শান্তনু। আমি ত স্যাব—নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে ব্যস্ত, কাজ কার কখন! সবকার আপনাদের পুষছেন কেবল উপরি রোজগাবেব জন্যে, কর্তব্য কিছুই আপনাদেব করবার নেই ?

বেলিফ। কর্তব্যের ত্রুটী কোথায় দেখলেন ? আমার হাতে পবওযানা এখনও আছে। পজেসান আমি দিতে এসেছি ?

শান্তনু। কর্তব্যের ত্রুটী না থাকলে সূর্যাস্তেব পূর্বেই আপনি ডিগ্রীদারকে পজেসান্ দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে পাবতেন; আমি আসা পর্যন্ত তামাসা দেখবাব জন্যে এখানে অপেক্ষা করতেন না।

বেলিফ। ত্রুটী যদি হয়ে থাকে সে আপনার উপস্থিতিতে, আমি ঠেকে গেছি, আপনাকে খাতির দেখাতে গিয়ে।

শান্তনু। তাই হয়ত ঠিক। আমি চললুম। মাপ করবেন অযথা আপনাকে তিবস্কার করলুম। আপনি পজেসান দিন। [হন হন করে কিছুটা আগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দীপ্তিকে...] আমি চললুম।

দীপ্তি। [চিৎকার করে] মামাবাবু বর যে চলে যাচ্ছে।

[সারদাপ্রসাদের প্রবেশ]

দীপ্তি। বর উঠে চলে যাচ্ছে।

সারদা। কেন? কেন? কেন বাবা, কি ক্রুটী হয়েছে?

শান্তনু। ক্রুটী! এই সব ব্যাপার সম্পূর্ণ গোপন রাখা, আর কোর্টের ডিগ্রী অবহেলা করা।

সারদা। আমরা ত এ সবের বিন্দু বিসর্গ জানতাম না।

শান্তনু। না জানা, সেটাও একটা ক্রুটী। এই চোখ বুজে জগৎটাকে অন্ধকার ভাবার পরিণাম সুদূর প্রসারী। আপাততঃ আজ এখানে বিয়ে হতে পারে না; আমিও আর একদণ্ড এখানে থাকতে পারি না।

[কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে আর কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তিনি দ্বারের দিকে হন্ হন্ করে আগিয়ে গেলেন।]

সারদা [চিৎকার করে] একি সর্বনাশ! একি সর্বনাশ কাণ্ড!

[দ্বারের সামনে বঙ্কিমশ্যাম শান্তনুর গতিরোধ করলেন, তাঁর সামনে আপনার ডান হাতখানি প্রসারিত করে তাঁকে আড়াল করে]

বঙ্কিম। দাঁড়ান একটু। আপনি আজ যার মেয়েকে বিয়ে করতে এসেছেন তাঁকে আপনি কখন দেখেননি। আজ এখন এভাবে এখান থেকে চলে গেলে এই অশান্ত জগতে কতবড় একজন শান্ত মানুষ থাকতে পাবে, তা আর আপনার এ জীবনে দেখা হবে না। আমি দেখেছি; আমি দেখেছি প্রবল ঝড়ে নিবাত নিকম্প স্থির দীপ শিখার মত তাঁর জীবনীশক্তিকে। আজ এইভাবে আপনি চলে গেলে সেই শান্ত শিখাটিকে আপনি এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়ে যাবেন। বিশ্বস্রষ্টার এক অপূর্ব সৃষ্টিকে বিচার করবার আত্ম-অভিমান দিয়ে রাহুর মত গ্রাস করে ফেলবেন।

[এদিকে সারদাপ্রসাদের চিৎকারে বন্দিতা পর্দা ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এইমাত্রে তার সাজ শেষ হয়েছে; কনের সাজে তাকে এমন মানিয়েছে যে দেখলে সহজে চোখ ফেরানো যায় না। বঙ্কিমবাবুর কথায় শান্তনু তাঁরদিকে পিছন করে দাঁড়াতেই সামনে কনের সাজে বন্দিতাকে দেখে সহজে চোখ নামিয়ে নিতে পারলেন না।]

বঙ্কিম। "Dull would he be of soul,
who could pass by
A sight so touching in its majesty!"

[শান্তনু বঙ্কিমবাবুর দিকে ফিরে দেখলেন, তাঁর অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টির সামনে চোখ নামিয়ে নিলেন। ঠিক এই সময় পর্দা ঠেলে সামনে এসে ভবতারিণী—দাঁড়ালেন। শান্তনু দেখলেন সামনে জগদ্ধাত্রী মূর্তি।]

দীপ্তি। [শান্তনুর দিকে চেয়ে] ইনি মা।

ভবতারিণী। এস বাবা

[এই আহ্বানে আর দ্বিধামাত্র না করে শান্তনু ভবতারিণীর পিছনে পিছনে মাথাহেঁট করে এসে আপনার নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। ভবতারিণী পাশে বসলেন। দীপ্তি বন্দিতার হাত ধরে সেই আসনের পিছনে দাঁড়াল। হলঘরখানি মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হল। শান্তনু মুখ তুলে চাইতেই সামনের বড় আয়নায় দৃষ্টি পড়ল মায়ের মুখে। সেই সঙ্গে চোখে পড়ল আর একটি মুখের প্রতিবিম্ব। দীপ্তি মুখে নিচু করে শান্তনুর কানে-কানে বলল—]

দীপ্তি। ছবি না আসল, কোনটি? আত্মহত্যা করবার অভিলাষ আর থাকতে পাবে? দেখুন না ভাল করে?

[লজ্জার মাথা খেয়ে শান্তনু আবার দেখলেন, চোখ নাবান যায় না। দুর্বার আকর্ষণ। একটু পরে বেলিফকে ইশারা করে ডাকলেন। বেলিফ এসে সামনে নতজানু হয়ে বসল হুকুমের অপেক্ষায়।]

শান্তনু। আপনি পুরানো লোক। আপনি আমায় পরামর্শ দিন, এ সমস্যার সমাধান কিসে হয়।

বেলিফ। খুব সহজে।

শান্তনু। খুব সহজে? কিসে বলুন ত?

বেলিফ। আমি যদি এখনই পদত্যাগ করে—এখান থেকে চলে যাই।

শান্তনু। আপনি পদত্যাগ করবেন?

বেলিফ। হাঁ হুজুর।

শান্তনু। তা হয় না; আর কোন উপায়?

বেলিফ। আছে।

শান্তনু। আছে! কি বলুন ত?

বেলিফ। আপনি আমাকে ডিস্‌মিস্‌ করুন।

শান্তনু। আপনাকে আমি ডিস্‌মিস্‌ড্‌ করব? কেন?

বেলিফ। আমার কাজের ক্রুটী আপনি ধরে ফেলেছেন।

শান্তনু। কি ক্রুটী?

বেলিফ। আমি কর্তব্যে অবহেলা করে পাওনাগণ্ডার হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম।

শান্তনু। তার কোন প্রমাণ নেই।

বেলিফ। আমি স্বীকার উক্তি দেব।

শান্তনু। স্বীকার উক্তি একমাত্র মানুষ নিজের মনের কাছে অকপটে করতে পারে। আপনার মনের কথা আমি কি জানি?

বঙ্কিম। [বেলিফকে] চাকরি গেলে আপনি কি করবেন?

বেলিফ। (উঠে দাঁড়িয়ে) হাওড়া ব্রীজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ভবতারিণী। কেন বাবা এ কুকর্ম করতে যাবে?

সারদা। [ধমক দিয়ে] ওদের সরকারী সলাপরামর্শে তুমি কেন কথা বলতে যাও!

শান্তনু। (বেলিফকে) আপনি কি আমার সঙ্গে রহস্য করছেন?

বেলিফ। না হুজুর স্বামীজির কথায় বললুম।

শান্তনু। স্বামীজির কথা!

বেলিফ। তিনি যে বলেছিলেন, "পারবি হাত পা ছেড়ে তাল গাছের মাথার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে!" এ শহরে আর তাল গাছ কোথায় পাব, তাই হাওড়া ব্রীজ বেছে নিলুম।

শান্তনু। কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ। ··· অনন্য-শরণতা!

[শান্তনু সহসা স্বপ্নাবিষ্টের মত সকলের কাছ থেকে উঠে গিয়ে একলা দাঁড়িয়ে আত্মগত ভাবে বলল]

"Surrender!...Surrender!...where one perceives impassable brick walls of difficulties, it passes miraculously through!"

[শান্তনু আবার নিজের আসনে এসে সহজভাবে বসল ; বেলিফের দিকে কঠিনভাবে চেয়ে দেখল]

বেলিফ। আমি মূর্খ মানুষ।

শান্তনু। মূর্খ মানুষেরাই মাঝে মাঝে দিব্যজ্ঞান দিতে আসে, নিতে জানা চাই। দুটী কথা আপনি বললেন, এক কাজের ক্রুটী, দুই হাত পা ছেড়ে তাল গাছের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়া। দুটোই আমার মনকে ঠিক কি করতে হবে বলে দিলে।

সারদা। [বেলিফকে] আর কত বক্ বক্ করবেন, যান না মশায় এখান থেকে, শুভকার্যের অযথা বিলম্ব করিয়ে দিচ্ছেন।

বেলিফ। যাব বলেই ত এঁর অনুমতি চাইছি। [শান্তনুকে] হুজুর আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে এখনই এস্থান ত্যাগ করবার অনুমতি দিন।

শান্তনু। [বেলিফকে] বেশ, আপনার পরামর্শই নিলুম। আপনার কাছে কাগজ আছে ? কলম আছে ? দিন।

[বেলিফ শান্তনুর হাতে একখানি সাদা কাগজ পকেট থেকে আপনার কলম ও লিখবার সুবিধার জন্য আপনার ফাইলটি দিল। শান্তনু লিখতে আরম্ভ করে লিখবার ভাষাটা কি হবে ভাববার জন্য মুখটি একবার তুললেন। আবার বন্দিতার মুখ সামনের আয়নায় চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নামিয়ে দ্রুত চিঠিখানি লিখে ফেললেন। লেখা শেষ করে চিঠিটি বেলিফের হাতে দিতে তার হাত থরথর করে কেঁপে উঠল। সে নিজে না পড়ে চিঠিখানি বঙ্কিমবাবুকে পড়তে দিল। বঙ্কিম-বাবুকে চিঠি পড়বার সুযোগ না দিয়ে, চিঠিখানি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ও বেলিফের মাঝখানে শান্তনু দাঁড়ালেন।]

শান্তনু। [বেলিফকে] বর্তমানে এখানে আপনিই কোর্টের একমাত্র প্রতিনিধি। যে মুহূর্তে এই পত্রখানি আপনার হাতে দেওয়া হল সেই মুহূর্তে এটা কোর্টে দাখিল করা হল বলে ধরে নিতে হবে ; এখন এটি কোর্টের নথিভুক্ত। কাল সকাল চীফ জজ সাহেব কোর্টে

বসবার আগেই তাঁর সামনে এটি দাখিল করবেন। এখন এটিকে আপনার ফাইলে রেখে দিন।

বঙ্কিম। কোর্টের প্রতিনিধি হিসাবে চিঠিখানি পড়বার অনুমতি ওকে দিন।

শান্তনু। হাঁ হাঁ নিশ্চয়ই আপনি পড়বেন। ফাইলভুক্ত করবার আগে, কোর্টের প্রতিনিধি হিসাবে নিশ্চয়ই আপনি জেনে নেবেন ফাইলে কি রাখা হল।

বেলিফ। [থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে চিঠিখানি পড়ল একবার, দু'বার, তারপর শান্তভাবে] একি সর্বনাশ! না না এ চিঠি আপনি ফিরিয়ে দিন। এ হুকুম আপনি ফিরিয়ে নিন।

[বেলিফ চিঠিখানি শান্তনুকে ফেরত দিতে গেল। তার প্রসারিত হাতখানি ধরে ফেলে]

শান্তনু। হাওড়া ব্রীজ থেকে লাফিয়ে পড়বার সাহস কে আমাকে দেখালে! স্বামীজির পরিপূর্ণ নির্ভরতার কথা কে আমাকে শোনালে! বিচার আসনে বসে ঘটনা বিশ্লেষণে যে অমার্জনীয় ক্রুটী, সে আমার অহঙ্কার সঞ্জাত, আমি করি, আমি বুঝি তারই পরিণাম—কে আমাকে মনে করিয়ে দিলে।

বেলিফ। উকিলবাবু আপনি একটু হুজুরকে বুঝিয়ে বলুন না?

বঙ্কিম। চিঠির বিষয়বস্তু আ[illegible]ত জানি না, কি বলব?

শান্তনু। ওকে দেখান।

বঙ্কিম। [চিঠিখানি পড়ে বেলিফের হাতে দিয়া] চুড়ান্ত রায়।

শান্তনু। আপনার শব্দ-ভেদী বাণের নজিরটি আমি গ্রহণ করেছি।

বঙ্কিম। তার জন্যে আপনাকে আমার অভিনন্দন, সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। [মুখ তুলে বন্দিতাকে দেখে] এ অভিনন্দন আমার তোমারি জন্যে। তোমাকেও জানাই আমার অভিবাদন, হাজার অভিবাদন!

বন্দিতা। বারে, আমি কি করলুম ?

বঙ্কিম। তুমি আদামকে স্বর্গচ্যুত করালে।

বেলিফ। হুজুর ! [নিশানদারকে দেখিয়ে] এদের কি বলি ?

শান্তনু। আর হুজুর নয়। আমি মব, রাস্তার ঐ জনতার মধ্যে একজন বাধাদানকারী বলে আপনি আপনার রিপোর্টে আমার নাম লিখে নিন।

বেলিফ। [নিশানদারকে] ইনি বাধাদান করছেন।

নিশানদার। আপনার যা করবার করুন ; ভাড়ার বিল দেখে নিন।

শান্তনু। ভাড়ার বিল আমার নেই ; আমি সাবটেনাণ্ট নই। তবে যাঁর নামে ডিগ্রী এখনও আমি তাঁর পরিবারভুক্ত হইনি। ঐ ডিগ্রী বলে আপনি আমাকে এখান থেকে তাড়াতে পারবেন না। আর আমি আজ যে অধিকারে এখানে প্রবেশ করেছি সে অধিকার ন্যায়সঙ্গত, সে অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব আইনের, সেই অধিকারের বলেই আমি কোর্টের বেলিফকে প্রত্যাখান করলুম, আর ডিগ্রী জারীতে বাধা দিলুম। [বেলিফকে] আমি কি অধিকারে আপনাকে বাধা দিলুম, তা স্পষ্ট করেই আপনার রিপোর্টে লিখে দেবেন। [নিশানদারকে] আপনার ডিগ্রী বেঁচেই থাকবে, বিধিসঙ্গতভাবে ব্যবস্থা নিলে, যথা সময়ে আবার ডিগ্রী জারী করতে পারবেন। [বেলিফকে] নমস্কার, আপনি তাহলে আসুন।

বেলিফ। নমস্কার। [নিশানদারকে] চলুন আমরা যাই।

নিশানদার। বিয়েটা যদি সত্যিই হয়, আমরা ফাঁক যাই কেন ?

বেলিফ। [নিশানদারের হাত ধরে] না, না, চলুন এখান থেকে। যতক্ষণ আমরা এখানে থাকব, বিয়ের কাজে বিঘ্ন ঘটবে। আচ্ছা সকলকে নমস্কার।

[বেলিফ ও নিশানদার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারপথে একটি প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি সকলের চেখে পড়ল'। বন্দিতা "বাবা" বলে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন—]

ধূর্জটি। বিয়ের সব যোগাড় হয়েছে ?

বন্দিতা। তোমার সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি ?

ধূর্জটি। আজ যে আমি তোমাকে সম্প্রদান করব, আমার ত খেতে নেই।

বন্দিতা। তোমার স্নান পর্যন্ত হয়নি ?

ধূর্জটি। এই দেখ গঙ্গাস্নান করে, গঙ্গায় আবক্ষ দাঁড়িয়ে নান্দী-মুখ সেরে এলুম।

সারদা। কাজের লোক !

ধূর্জটি। গাড়ীটা রেখে এলে বলে, এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলুম।

সারদা। এত তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে সকলের হয়ে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর দেরি করলে তোমার আর বিয়ে দেখা হত না।

ধূর্জটি। লোকে ভাবত আমি পলাতক আসামী।

সারদা। আদালতের হাকিম যার জামাই সে কেন পালিয়ে বেড়াবে ?

ধূর্জটি। [বঙ্কিমকে] একেবারে কাছারির পোশাকে আপনাকে এখান অবধি দৌড় করালুম।

বঙ্কিম। শেষ রক্ষা হয়েছে, এবার ছুটি চাই।

ধূর্জটি। [তাঁর হাত দুটী ধরে] শেষ রক্ষা যখন করালেন, একেবারে দাঁড়িয়ে বিয়েটা দিয়ে তবে ছুটি নেবেন।

বঙ্কিম। বিয়েতে আমার নিমন্ত্রণ হয়নি।

ধূর্জটি। এই দেখুন এত লোকের সামনে আমার লজ্জার কথাটা ফাঁস করে দিলেন।

সারদা। উকিলবাবু কেবল আপনিই নন এ বিয়েতে আমারও নিমন্ত্রণ হয়নি, আমিও রবাহুত।

ধূর্জটি। যখন হাটে হাঁড়ি ভেঙেই দিলে তখন আমার লজ্জার কথাটি খুলেই বলি। কাল সন্ধ্যায় প্রথম আবিষ্কার করলুম নিমন্ত্রণ পত্র গুলির উপর যেমন নাম লেখা, তেমনিই সব পড়ে আছে, একখানিও বিলি করা হয়নি। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে চিঠিগুলির উপর নাম লেখা হয়। ঠিক করেছিলুম কোথাও আমি নিজে যাব, কোনটা ডাকে পাঠাব। তারপর একটা ছবি নিয়ে পড়লুম; একটা সপ্তাহ কোথা দিয়ে যে কেটে গেল টেঁরই পেলুম না; টের পেলুম সবে কাল সন্ধ্যায়।

সারদা। সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে ছুটে গেলে না কেন্?

ধূর্জটি। হয়ত তাই যেতুম; কিন্তু আরও বড় বাধা এসে পড়ল। আমাদের পাড়ার শশীবাবু ছোট আদালতে কাজ করেন, তিনি সংবাদ দিয়ে গেলেন, তিনি জানতে পেরেছেন আমার উপর একতরফা একটা ডিগ্রী হয়ে গেছে, ডিগ্রীজারী করতে আসবে আজই। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলুম এঁর বাড়ী। এঁকেও কিছু বলা হল না, যে ধমকানি ইনি আমাকে দিলেন!

বঙ্কিম। ওটা আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন রাত আটটা, হুকুম করে বসলুম সকাল আটটায় সব টাকা যোগাড় করে নিয়ে যেতে।

ধূর্জটি। কথাটা রাখতে পারলুম না।

বঙ্কিম। এই নিন্ আপনার সব টাকাগুলো কিছুই কাজে এল না।

ধূর্জটি। কাজে এল না! তাহলে।

বঙ্কিম। অনেক বেশি মূল্য দিতে হ'ল।

ধূর্জটি। কোথা থেকে এল?

বঙ্কিম। [শান্তনুকে দেখিয়ে] ইনি দিলেন।

ধূর্জটি। না, না, এ যে পরম পরিতাপের কথা! আমার পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা হচ্ছে! কতটাকা তোমায় দিতে হল?

শান্তনু। টাকা আমায় কিছুই দিতে হয়নি।

ধূর্জটি। তবে কি দিতে হ'ল ?

শান্তনু। আমি শুধু আমার উপাধিটুকু বর্জন করেছি।

ধূর্জটি। [বঙ্কিমবাবুকে] সে কি ? আমি ত বুঝতে পারলুম না।

বঙ্কিম। উনি ওনার জজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এইমাত্র ওঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

ধূর্জটি। তাতেই সব গোল মিটে গেল ?

বঙ্কিম। আপাততঃ। বিবাহ কার্য্য নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হতে পারবে।

ধূর্জটি। কিন্তু জজের চাকরি সে ত বহুবাঞ্ছিত ! তুমি ত্যাগ করতে গেলে কেন ?

শান্তনু। মাটির পৃথিবীটা কতখানি বাস্তব তাই চোখ মেলে চেয়ে দেখব বলে।

ধূর্জটি। [শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ শান্তনুর দিকে চেয়ে থেকে] "ন হি কল্যানকৃত কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

দীপ্তি। মেশোমশায়, আপনার শ্রীভগবান উবাচ থামাবেন ! লগ্ন যে বয়ে যায়।

ধূর্জটি। এই দেখ মা, কিছুতেই আমার হুঁস্ থাকে না।

দীপ্তি। বর নিয়ে যাবার, বিয়েতে বসবার অনুমতি দিন। গঙ্গাস্নান ত সেরেই এসেছেন ! পট্টবস্ত্র পরে এসে সম্প্রদান করতে বসুন।

ধূর্জটি। হ্যাঁ এই যাই ! [যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে] বিয়েতে যাঁদের নিয়ে আনন্দ করবার তাঁদের কাউকে আমন্ত্রণ জানাতে পারলুম না।

দীপ্তি। সে ত্রুটী আমরা সেরে রেখেছি। আনন্দ যারা করবে তাঁদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছি। সব ঐ সামনের পার্কে।

অপেক্ষা করছে ; ওদের সঙ্গে আছে বরযাত্রীদল, পুরোহিত, বরকর্তা আর সকলে, আপনি অনুমতি করলে সকলকে সঙ্গে করে সমাদরে নিয়ে আসি।

ধূর্জটি। চল আমিও যাই, আমার ত্রুটীর জন্যে ক্ষমা চেয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসি।

সারদা। আর তোমায় সমাদর দেখিয়ে কাজ নেই, আমিই যাই। [ভবতারিণীকে] একে আর বরকে ভেতর নিয়ে যাও। লগ্ন আরম্ভ হয়ে গেছে। (হাতের ঘড়ি দেখে)

(ভবতারিণী শান্তনুকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে গেলেন, পিছনে পিছনে ধূর্জটিপ্রসাদও বন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, সারদাপ্রসাদ বাইরে গেলেন, নেপথ্য থেকে তাঁর উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আসুন, আপনারা সকলে আসুন, এসে বিয়ের কাজ শুরু করে দিন।")

দীপ্তি ও ছায়া। [দর্শকদিগের দিকে মুখ করে] আসুন আপনারা আসুন, শুভকার্য সুসম্পন্ন করিয়ে দিয়ে যান।

[যবনিকা]

সন্ন্যাসীর গীত

নাটকের পাত্র-পাত্রী

কৃষ্ণকিশোর

কমলা

ত্রিবেদী সাহেব

শ্রীগণেশ

অমিতাভ

মমতা

॥ সন্ন্যাসীর গীত ॥

[কৃষ্ণকিশোরবাবুর বসবার ঘরখানি প্রশস্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের উপযুক্ত মত সাজান। নাটকের প্রয়োজনে একটি সোফা সেট্, দেওয়ালে লাগান একটি ব্রাকেট্ টেবিল ও দেওয়ালে টাঙ্গান একটি ঘড়ি থাকলেই চলবে।

কৃষ্ণকিশোরবাবু বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি হন্তদন্ত হয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘড়ি বেজে উঠল ; ঠং ঠং করে আটটা বাজল। কৃষ্ণকিশোরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, একটু কি ভাবলেন, তারপর ফিরে এসে বসে পড়লেন।

স্ত্রী কমলা বিপরীত দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তাঁকে বসে পড়তে দেখে ঘরের মধ্যে এলেন।]

কমলা। কি হ'ল, বসলে ?

কৃষ্ণকিশোর। বস।

কমলা। [বসল] গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ?

কৃষ্ণ। আমার যাওয়া ঠিক হবে না।

কমলা। কেন ঠিক হবে না ?

কৃষ্ণ। আমার তাই মনে হচ্ছে।

কমলা। শোন কথা ! আটটা বেজে গেল, ন'টায় তাকে ছেড়ে দেবে। এত আয়োজন করার পর এই কথা তোমার মনে হ'চ্ছে ? বেশ কথা ত ! নাও উঠে পড়।

কৃষ্ণ। তুমি বুঝতে পারছ না।

কমলা। বুঝব আবার কি ?

কৃষ্ণ। আমাকে দেখলে সে কিছুতেই আসতে চাইবে না।

কমলা। তবে কি আমি যাব ? আমায় যেতে বল ?

কৃষ্ণ। তুমিই যাও।

কমলা। কথাটা মুখে বাধল না ?

কৃষ্ণ। আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকছে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে।

কমলা। কতবার ত গেছ? দেখা ত করেছে?

কৃষ্ণ। পারিনি দেখা করতে। জেলের ফটক পর্যন্ত গেছি; দেখা না করেই চলে এসেছি।

কমলা। এ আবার কি নতুন কথা শোনাচ্ছ?

কৃষ্ণ। প্রথম যেদিন গেছলুম,—

কমলা। কবেকার কথা বলছ?

কৃষ্ণ। সেই তার জেল হবাব কয়েকমাস পরেই। তুমি পাঠিয়েছিলে আমাকে দেখা কবে আসতে। কত কথা বলব ভেবে গেলুম। [একটু থেমে] কিছুই বলা হয়নি, দেখা না করেই চলে এসেছিলুম।

কমলা। তুমি ফিরে এসে কেমনধারা হয়ে শুয়ে পড়লে। আমিও তোমার মনের অবস্থা বুঝে কোন কথা তুলিনি। তবে সেদিন তুমি দেখা করনি? যাওনি বোধ হয?

কৃষ্ণ। গেছলুম; দেখা করবার অনুমতি করিয়ে নিয়েছিলুম;

কমলা। দেখা হল না কেন?

কৃষ্ণ। সে দেখা কববার জন্যে যখন আসছিল, দূর থেকে তাকে দেখলুম। সেই টানা টানা বড় বড় দুটো চোখ। কোন রাগ নেই, কোন ক্ষোভ নেই, শান্ত নির্লিপ্ত দুটো চোখ। সে যদি তখন আমাকে দু'ঘা চাবুক মারত, আমি বলতুম, ঠিক কবেছ বাবা, এই শাস্তিই আমার প্রাপ্য। কিন্তু সেই দুটো চোখে কি যে তিবস্কার লুকোনো ছিল! আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলুম না; দেখা না করেই পালিয়ে এলুম।

কমলা। আরও ত কতবার তুমি গেছ?

কৃষ্ণ। গেছি, জেলের ফটক পর্যন্ত। খবর নিয়েছি, সে ভাল আছে; তারপর দেখা না করেই চলে এসেছি।

কমলা। বরাবর?

কৃষ্ণ। বরাবর।

কমলা। বরাবর আমাদের তুমি মিথ্যে বুঝিয়ে এসেছ?

কৃষ্ণ। তা না হলে কি তোমাদের বলতুম? কি বলে তোমাদের ভোলাতুম?

কমলা। আজকেব এত আযোজন! সেও কি কেবল আমাদের ভোলাবাব জন্যে?

কৃষ্ণ। না, আজ সে আসবে। ঠিক আসবে দেখ।

কমলা। কিসে বুঝলে? তুমি ত' দেখা কবনি তাব সঙ্গে?

কৃষ্ণ। দিন চাবেক আগে শেষ যখন যাই, দেখা করেছিলুম।

কমলা। সত্যি দেখা কবেছিলে?

কৃষ্ণ। সত্যি দেখা কবেছিলুম।

কমলা। কথা কযেছিলে?

কৃষ্ণ। কয়েছিলুম।

কমলা। কি কথা বললে?

কৃষ্ণ। এখন আব আমাব কিছু মনে নেই।

কমলা। আসবাব কথা? এখানে আসবাব কথা বললে?

কৃষ্ণ। আজ চার বছব ধ'বে যত কথা বলব বলে বাববাব মনে মনে আওড়েছি, সব আমি গড়গড় কবে বলে গেছলুম।

কমলা। নিজেই বকে গেলে, তার কথা কিছু শুনলে না?

কৃষ্ণ। কথাব মধ্যে যতবাব মমতাব নাম কবেছি সে মুখ তুলে চেযে দেখেছে।

[মমতা একটি কলাপাতার মোড়ক নিয়ে প্রবেশ করল।]

মমতা। বাবা, এই মালাটি তুমি নিযে যাবে না? আমাকে মনে কবিযে দিতে বলেছিলে?

কৃষ্ণ। [মেয়েকে কিছুক্ষণ দেখে] মা, আজ তুই সেজেছিস্?

[মমতা কলাপাতার মোড়কটি ব্রাকেট্ টেবিলের উপর রেখে পালিয়ে গেল।]

কমলা। মেয়েকে তাড়ালে ত?

কৃষ্ণ। সে আসবে, তাকে আসতেই হবে; এরই জন্য তাকে আসতেই হবে।

কমলা। তবে যাও, আর কথা বাড়িও না, বেরিয়ে পড়।

কৃষ্ণ। মেয়েটা সেজেছে দেখেছ? দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল।

কমলা। আজ চার বছর মেয়েটাকে কখন সাজাতে পারিনি; একটা ভাল শাড়ী কখন পরাতে পারিনি।

কৃষ্ণ। মার আমার ঐ কাঙালিনী বেশ আজ ঘুচল।

কমলা। বালাই, কাঙালিনী হতে যাবে কেন! মা আমাদের তপস্বিনী সেজে ছিল। চার বছর উমা মায়ের মত তপস্যা করেছে।

কৃষ্ণ। দেখে দেখে আমিও হিমালয়ের মত পাষাণ হযে গেছলুম।

কমলা। লুকিয়ে লুকিয়ে কত যে কেঁদেছে!

কৃষ্ণ। আমি টের পেতুম।

কমলা। বিয়ের পর মেয়েকে বিলেত পাঠিয়ে তখন থাকবে কেমন করে?

কৃষ্ণ। অতদূর ভাবছি না, ভাবতে পারছি না. এখন শুধু ভাবনা বিয়েটা কেমন করে হবে।

কমলা। একবার কেবল এনে ত হাজির কর।

কৃষ্ণ। তা ত আমি করছিই।

[যাবার জন্য উদ্যত হতে...]

কমলা। হাঁ, দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।

কৃষ্ণ। আচ্ছা ভোররাত্রে মরা মানুষকে স্বপ্ন দেখা, ভাল?

কমলা। আবার কাকে স্বপ্ন দেখলে?

কৃষ্ণ। আবার কাকে?

কমলা। তিনি মহৎ লোক।

কৃষ্ণ। দিনটা ভালই যাবে বলছ?

কমলা। ভাল যাবে না, কাকে বাড়ীতে আনছ?

কৃষ্ণ। [চুপি চুপি] রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম?

কমলা। তোমার গায়ে হাত দিতে তুমি ধড়মড় করে উঠে বসলে।

কৃষ্ণ। ঠিক ঐ সময়!

কমলা। কি?

কৃষ্ণ। আবার সেই!

কমলা। আবার কি?

কৃষ্ণ। সেই পুরনো স্বপ্ন! সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে হয়রান হয়ে চলেছি, সন্ধ্যার অন্ধকারে, অন্ধকার গলির মুখে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা; আমার মত তিনিও হয়রান হয়ে হারান ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

কমলা। আর কি হবে ওসব কথা তুলে, চুপ কর।

কৃষ্ণ। চুপ করতে পারলুম কোথা! আমাকে সামনে দেখে, আমার হাত দুটো চেপে ধরে তিনি যখন কেঁদে বললেন,—"চল বন্ধু, আমরা দু'জনে একসঙ্গে খোঁজ করি; দুটিতে কোথায় পথ হারিয়ে ফেলেছে।" কেন তখন এক ঝটকায় তাঁকে হাটিয়ে দিলুম?

কমলা। তুমি কি করবে, তোমার ভাগ্য করিয়েছিল।

কৃষ্ণ। ভাগ্য কি এখনও আমায় নিষ্কৃতি দেবে না? কেন তাঁকে চোর বলে গাল দিয়ে উঠলুম, কেন তাঁর ছেলেকে পুলিসে দেব বলে শাসিয়ে উঠলুম?

কমলা। আস্তে, আস্তে, এত চেঁচিয়ে নয়!

কৃষ্ণ। আবার কেন ঐ স্বপ্ন দেখলুম?

কমলা। অসুখটা ত তোমার সেরে গেছল?

কৃষ্ণ। ছমাস ত আর ওসব দুঃস্বপ্ন দেখিনি!

কমলা। যাবার সময় সব রোগ একবার জানান দিয়ে যায়।

কৃষ্ণ। এতদিন পরে এই কাল ব্যাধির যাবার ইচ্ছে হল?

কমলা। এতদিন পরে আমাদের দুঃখের রাত্রি যে ঘুচল।

কৃষ্ণ। কাল ভোর হতেই এই কথাটি আমার মনে হল। মনে হতে মনটা কি হালকা বোধ করলুম! যেন আর কোন দুঃস্বপ্ন,

কোন দুশ্চিন্তা নেই। আর একটা রাত। একটা রাত কাটালেই সে খালাস পাবে। খালাস পেয়ে সে আবার সামনে এসে দাঁড়াবে।

কমলা। এখনিই ত এসে দাঁড়াবে?

কৃষ্ণ। এই কথা মনে হতেই, যত রাজ্যের পুরানো সব কথা মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল। সারাদিন ঐ চিন্তাগুলির গলাটিপে ধরেছি; রাত্রে, তাই তারাই দুঃস্বপ্ন হয়ে আমার গলা টিপতে এসেছিল!

[মমতার প্রবেশ]

মমতা। বাইরে কে যেন তোমার খোঁজ করছেন।

কমলা। ঐ দেখ, আবার কে এসে গেল। বলছি বেরিয়ে পড়, বেরিযে পড়; শুনছ না, খামকা দেরি করছ। কে এল দেখ। দু'কথায় ওকে বিদেয় করে বেরিয়ে পড়। আর একটুও দেরি করোনা। চল্ মা, আমরা যাই।

[কমলা ও মমতা ভিতরে গেল। কৃষ্ণকিশোর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই একজন অপরিচিত ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, নাম শ্রীগণেশ .)

গণেশ। এইটি কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর বাড়ী?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ; কি চান?

গণেশ। চৌধুরী মশায় আছেন?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমি।

গণেশ। আপনি আজ অবসর-প্রাপ্ত জেলাজজ ত্রিবেদী সাহেবকে নিমন্ত্রণ করেছেন?

কৃষ্ণ। ত্রিবেদী সাহেব? জজ সাহেব?

গণেশ। তিনি এসে গেছেন।

কৃষ্ণ। এসে গেছেন? এখন।

গণেশ। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ঐ পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে পাঠালেন বাড়ী ঠিক করতে আর আপনি আছেন কিনা জানতে।

কৃষ্ণ। আমি ত আছি। তিনি এখন এলেন! নিমন্ত্রণ রাত্রের, রাত্রি আটটায়।

[হাতে একটি মোটা লাঠি নিয়ে ত্রিবেদী সাহেব প্রবেশ করলেন।]

ত্রিবেদী। এই যে, নমস্কার। দেখুন সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমাব মস্তিষ্কটি পর্যন্ত আমাব কাছ থেকে অবসর গ্রহণ কবেছে। তাই ভুল—দেখুন না, নিমন্ত্রণ রাত্রি আটটায়, সকাল আটটায় এসে হাজির।

কৃষ্ণ। আপনার ত বড় কষ্ট হল?

ত্রিবেদী। তা না হয় হল। কিন্তু এখন কি করা? বসা, না বিনা আপ্যায়নে বিদায় নেওযা?

কৃষ্ণ। না, না, সে'কি কথা, আপনি বসুন বসুন।

[ত্রিবেদী সাহেব বসলেন।]

ত্রিবেদী। ধন্যবাদ। ইনি আমার প্রতিবেশী বন্ধু; সঙ্গে নিয়ে এলাম। অবসব নেবাব সঙ্গে সঙ্গে একজন সঙ্গী না নিয়ে পথে বের হতে পাবি না। সরকারী চাপরাসী আর ত পাওয়া যায় না। এঁকেও বসতে বলি?

কৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ, বিলক্ষণ বসুন—বসুন।

ত্রিবেদী। বসুন শ্রীগণেশ। এঁব নাম গণেশবাবু, আমি ডাকি আধুনিক রীতিতে শ্রীগণেশ। গৃহস্বামী, আপনি? বসবেন? না দাঁড়িয়ে থাকবেন?

কৃষ্ণ। হাঁ বসি, এই বসি। [বসলেন।]

[ওপাশের ঘর থেকে চুড়ির আওয়াজ শু'নে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন।]

আমার একটু...

ত্রিবেদী। বেরোবার ছিল? গাড়ী ত দাঁড়িয়েই দেখলুম, আপনার জন্যেই ত?

কৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ, যদি অনুমতি করেন, এই যাব আর আসব।

ত্রিবেদী। অনুমতি আপনি করবেন আমাদের এখানে বসে থাকবার, আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত। আপনার যখন যাবার নিশ্চয়ই যাবেন।

কৃষ্ণ। যদি কষ্ট করে কিছুক্ষণ বসেন ত,··· আমি এই যাব আর আসব।

ত্রিবেদী। কতদূর?

কৃষ্ণ। এই, এই,...

ত্রিবেদী। জেলখানা পর্যন্ত?

কৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ।

ত্রিবেদী। [উচ্চ হাসি] ও হো, হো হো, হবু জামাতা বাবাজীকে সংবর্ধনা করে আনতে যাচ্ছেন? যান, শুভকার্যে আর বাধা নয়। তাকে মহামান্যভরে নিয়ে আসুন। আমরা অবশ্যই বসে থাকব তাঁকে এইখানে সংবর্ধনা জানাতে।

কৃষ্ণ। আমাব বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আর দ্বিতীয় নেই—

ত্রিবেদী। সে জন্যেইত একে আনা; আমবা দু'জনে বেশ খোশগল্পে থাকব। আমাদের জন্যে কিন্তু করবার নেই। আপনি এগিয়ে পড়ুন আর দেবি করবেন না। দেরি দেখলে, হয়ত বলা যায় না, বাবাজীর গোসা হয়ে যেতে পাবে; বৈরাগ্যও আসতে পারে, যেদিকে দুচোখ যায় চলেও যেতে পারে।

কৃষ্ণ। হাঁ, না না, না। আমি আসছি। কিছু মনে করবেন না; একলা বসিয়ে রেখে গেলুম।

[কৃষ্ণকিশোর যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। মালার মোড়কটির দিকে একবার চাইতেই ত্রিবেদী সাহেবের দৃষ্টিও মোড়কটির উপর পড়ল। তিনি বুঝেই একটু বক্রহাসি হেসে মোড়কটি তুলে নিয়ে কৃষ্ণকিশোরকে দিতে গেলেন।]

ত্রিবেদী। এই যে!

[কৃষ্ণকিশোর ত্রিবেদীর চোখদুটি ও বক্র হাসি দেখে, হাত নেড়ে "না, থাক" "প্রয়োজন নাই"—এই ভাব দেখালেন।]

ত্রিবেদী। সেই ভাল, জামাই বরণটা জেলের ফটকে কেমন যেন!

[কৃষ্ণকিশোর ত্রিবেদী সাহেবের কথা শেষ হবার পূর্বেই চলে গেলেন। ত্রিবেদী উচ্চৈঃস্বরে হেসে মালার মোড়কটি যেখানে ছিল সেইখানেই রেখে দিলেন।]

ত্রিবেদী। বুঝলেন কিছু?

গণেশ। না।

ত্রিবেদী। বিচারক যাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে জেলে পাঠালেন, জেল থেকে বেরোবার সময় তার গলায় মালা দিয়ে আপ্যায়ন করলে বিচারের প্রতি কটাক্ষ করা হয় না?

গণেশ। মৃত দেহে মাল্যদান করলে কি যমের প্রতি কটাক্ষ করা হয়?

[ত্রিবেদী সাহেব যেন চমকে উঠলেন এই প্রশ্নে, কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে শ্রীগণেশের দিকে চেয়ে থেকে পরে বললেন,—]

ত্রিবেদী। হয়; কিন্তু যখন লক্ লক্ করে ওঠে তার নির্দয় জিহ্বা তখন কোথায় থাকে ফুলের আর মালার স্তূপ! সব ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নগ্ন দেহখানিকে মুখটি বুজে সঁপে দিতে হয় সেই লেলিহান মুখের গহ্বরে।

গণেশ। জেলের মেয়াদ ফুরোলেও কি সে আগুন নেবে না?

ত্রিবেদী। নিবে যাওয়াই স্বাভাবিক; হয়ত এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল!

গণেশ। অপরাধ এতই গুরুতর?

ত্রিবেদী। রায় দেবার দিন বিচারকের সংযম আমি রক্ষা করতে পারিনি। রাগের মাথায় আসামীকে বলেছিলুম, আইনে এর চেয়ে বেশি শাস্তি তোমায় দিতে পারলুম না।

গণেশ। কি শাস্তি দিয়েছিলেন?

ত্রিবেদী। চার বছর জেল।

গণেশ। চার বছরের জেল! তাও বেশি নয়?

ত্রিবেদী   অপরাধের তুলনায় নয়। তাই আসামীকে সম্বোধন করে বলেছিলুম, যদি আমার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকত, যদি তোমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চাবকাতে পারতুম, যে গুরুতর অপরাধ তুমি করেছ, তার কিছুটার প্রতিবিধান হতো।

গণেশ। তাতে বাধল কিসে?

ত্রিবেদী। [নিজের হাত দু'টি বাঁধা অবস্থায় দেখিয়ে] আইনের বেড়ি···তারপর ব্যাপারটা ভুলেই গেছলুম।

গণেশ। আগুন তাহলে নিবে গেছল'?

ত্রিবেদী। আগুন ত নিবেই যায়।

গণেশ। তবে আজ পুনশ্চ কেন?

ত্রিবেদী। পুনশ্চের উপলক্ষ ঐ ভদ্রলোক।

গণেশ। কোন?

ত্রিবেদী। ঐ যে গৃহস্বামী।

গণেশ। যিনি আমাদের বসিয়ে গেলেন?

ত্রিবেদী। বিনা ভূমিকায় একদিন জানা নেই, কথা নেই, হুম করে আমার বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন।

গণেশ। প্রয়োজন?

ত্রিবেদী। প্রয়োজন আমাকে নিমন্ত্রণ করা, সেটা গৌণ, মুখ্য আমাকে দিয়ে এক বিবাহের প্রস্তাব করান।

গণেশ। একেবারে ঘটকালি?

ত্রিবেদী। অবসরপ্রাপ্ত হাকিম, কাজেই মাই ডিয়ার লোক আমি!

গণেশ। রাজি হ'লেন?

ত্রিবেদী। হলুম।

গণেশ। ঘটকালি ক'রতে রাজী হলেন?

ত্রিবেদী। হলুম।

গণেশ। বিয়ে কার?

ত্রিবেদী। আমিই যাকে জেলে পাঠিয়েছিলুম।

গণেশ। মেয়ে কার?

ত্রিবেদী। ঐ ভদ্রলোকের।

গণেশ। আচ্ছা।

ত্রিবেদী। একদিন যাকে জেলে পাঠাবার জন্য সে কি জিদ! আজ তারি হাতে মেয়েকে তুলে দেবার জন্যে কি আমাকে অনুনয়।

গণেশ। বিয়ে কবে?

ত্রিবেদী। আজ সকালে ছেলেটি জেল থেকে খালাস হয়ে ফিরছে; আজ রাত্রে উনি ওনার আত্মীয়-বন্ধুদের একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন। সেই ভোজে আমিও নিমন্ত্রিত। ভোজ সভায় প্রধান অতিথির আসন আমাকে গ্রহণ করতে হবে।

গণেশ। শুধু আসন গ্রহণ? না, ভাষণ প্রদানও আছে?

ত্রিবেদী। তাও আছে, তবে নিজের নয়, নাটকের পার্ট মুখস্থ বলার মত।

গণেশ। মুখস্থ হয়েছে?

ত্রিবেদী। বলব শুনবেন?

গণেশ। বলুন না।

ত্রিবেদী। [অভিনয়ের ভঙ্গী করে] "দেখুন মশায়, ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। যা হবার হয়েছে। এবার ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভেবে উভয়ের বিয়ে দিন। এই শুভ প্রস্তাব আমি করি, আর আপনারা যারা আছেন, নিশ্চয়ই আমাকে এই প্রস্তাবে সমর্থন করেন।" আমি এই কথা বলার পর উপস্থিত আর সকলে এক বাক্যে বলে উঠবেন,—

গণেশ। পৌরোহিত্যটাও আপনিই করুন।

ত্রিবেদী। কিছুই আশ্চর্য নয়, তাও বলতে পারে।

গণেশ। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ; আপনি পৌরোহিত্য করলে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হবে।

ত্রিবেদী। উপরন্তু আমাকে দিয়ে এও স্বীকার করিয়ে নেওয়া হবে, সেদিন বিচারের নামে আমি শুধু একটি প্রহসনের অভিনয় করেছিলুম।

গণেশ। আপনি ত রাজী হয়েই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন ?

ত্রিবেদী। রাজী হয়েছি, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি আত্মীয়-কুটুম্বদের সামনে সেদিনের বিচারটিকে প্রহসন ব'লে চালিয়ে দেবার জন্যে নয়।

গণেশ। তবে ?

ত্রিবেদী। সেদিন বিচারে যে ক্রটীটুকু রেখে দিয়েছিলুম, তাই পূর্ণ করতে। এই দেখুন।

[ত্রিবেদী সাহেব তাঁহার হাতের লাঠিটির মাথার প্যাঁচ' খুলে তার ভিতর থেকে একটি চাবুক টেনে বের করে ফেললেন।]

গণেশ। এ কি!

ত্রিবেদী। চাবুক।

গণেশ। চাবুক কি হবে ?

ত্রিবেদী। রাত আটটায় নিমন্ত্রণ সকাল আটটায় রাখতে এসেছি ভুল করে নয়; ভদ্রলোকের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা দেখাতে। রাত্রে এত আত্মীয়-কুটুম্বদের সামনে ছেলেটিকে ধরে চাবকালে যে অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, তাই এড়াতে!

গণেশ। ছেলেটাকে চাবকাবেন ?

ত্রিবেদী। হাঁ, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চাবুক হাতে এই আমি দাঁড়ালুম।

গণেশ। সেও ত জেলখাটা ছেলে!

ত্রিবেদী। আমার ওপর ছোকরাটি লাফিয়ে পড়বে ?

গণেশ। যদি পড়ে ?

ত্রিবেদী। তাই ত আপনাকে এনেছি সঙ্গে করে, দেহরক্ষী হিসাবে।

গণেশ। এখনই ত' ছেলেটি এখানে আসছে ?

ত্রিবেদী। তবে কি শুনলেন ? যেমন সে এই ঘরে পা দেবে,....

গণেশ। আপনি চাবকাতে সুরু করে দেবেন?

ত্রিবেদী। সঙ্গে সঙ্গে।

গণেশ। [ভয় পেয়ে] আমি তবে যাই।

[পালাবার উপক্রম করলেন]

ত্রিবেদী। [তাঁকে ধরে এনে] আপনি শুধু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখবেন। কয়েক ঘাতেই বাছাধনের এই বাড়ীর জামাই হওয়ার সখ মিটিয়ে দেব।

গণেশ। ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় যে ব্যবস্থা করেছেন?

ত্রিবেদী। চার বছর আগেই তা করতে পারতেন।

গণেশ। এ তাঁর ঘরের কথা!

ত্রিবেদী। ঘরের কথা নয়, সমাজের কথা। আজ রাত্রে ঐ ছোকরা এই ঘরের জামাই হবে। কাল রাত্রে এ মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে অন্য মেয়ের পেছনে ছুটবে। এই সামাজিক ব্যাধির ঔষধ, এই! এই! এই!

[ত্রিবেদী সাহেব সজোরে সোফার উপর চাবুক চালাতে লাগলেন। শব্দ শুনে মমতা ঘরে ছুটে এল।]

মমতা। এ সব কি? কে আপনারা?

ত্রিবেদী। তুমি কে? ও হো, হো হো চিনেছি, চিনেছি, চিনেছি, তুমি অভিসারিকা!

মমতা। কে আপনি?

ত্রিবেদী। তোমাকে ত আমি দেখেই চিনেছি। তুমি ত চিনতে পারলে না আমাকে?

মমতা। না।

ত্রিবেদী। আমার কোর্টে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তুমি যখন কান্নায় ফেটে পড়েছিলে, তখন আমারও বুকটা ফেটে গিয়েছিল। আজ তুমি চোখের জল মুছে ফেলেছ! বাবার কথায় অভিসারিকা সেজেছ! তা বেশ! কিন্তু আমায় চিনলে না ত!

মমতা। চিনেছি। ঐ মুখ আমার দুঃস্বপ্ন! ঐ মুখ ঘুমের মধ্যে কতবার আমার গলা টিপতে এসেছে, ভূতের মত।

ত্রিবেদী। আসলে যে ভূত তোমায় পেয়েছিল, আবার আজ যে ভূত তোমায় ধরতে আসছে, সেই ভূত ছাড়াতে আজ আমি এসেছি। এবার জজ সেজে নয়, রোজা সেজে।

মমতা। রোজারা ত হাতুড়ে হয়। জজিয়তি করলেন সেও কি হাতুড়ের মতন?

ত্রিবেদী। ওঃ চাবুক ত তুমিই আমায় মারলে এক ঘা!

মমতা। চাবুক এনেছেন কেন?

ত্রিবেদী। অভিনয় করতে। এবার বন্ধ করলুম।

[ত্রিবেদী সাহেব লাঠির মধ্যে চাবুক পুরে প্যাঁচ কষে দিলেন।]

ত্রিবেদী। এ এখন বুড়োর লাঠি। বস; আমরাও বসছি।

মমতা। বাবার জন্যে?

ত্রিবেদী। তোমার বাবা আমাদের বসিয়ে গেছেন। আমরা এসেছি, তাঁর নিমন্ত্রণে।

মমতা। তবে বসুন।

ত্রিবেদী। বাবা কোথায় গেলেন?

মমতা। বাবার সঙ্গে ত কথা হয়েছে।

ত্রিবেদী। ও, হা! আমারি ভুল।

মমতা। আপনার ভুল ত পদে পদে।

ত্রিবেদী। আমার ভুল পদে পদে?

মমতা। তাই ত। হাকিমই হয়েছেন। বিচার করেন সব ভুল।

ত্রিবেদী। বিচার করি সব ভুল? কিসে বুঝলে?

মমতা। আপনার বিচার দেখে। দোষ করে একজন জেলে যায় আর একজন।

ত্রিবেদী। নিজের ঘাড়ে দোষ তুমি নিতে চেয়েছিলে, কিন্তু তুমি যে তখন খুকী।

মমতা। একটা কীটপতঙ্গ নিজেদের ভাল মন্দ বোঝে, আর খুকীরা বোঝে না নিজেদের ভাল-মন্দ ?

ত্রিবেদী। বোঝে,—বয়স হলে।

মমতা। ভাল মন্দ যে বোঝে সে ছেলেবেলা থেকেই বোঝে; যে বোঝে না, আশী বছরেও সে বুঝতে পারে না।

ত্রিবেদী। এটা তোমার মায়ের কাছে শেখা; আইনের কথা নয়।

মমতা। শঙ্করাচার্য আট বছর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। আপনার মত জজ তখন থাকলে তাঁর বাপকে ধরে জেলে পুরতেন, নাবালক ছেলের এই কাণ্ডের জন্যে বাপকে অপরাধী করে।

ত্রিবেদী। [উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন] এ ত বড় অকাট্য যুক্তি তোমার !

মমতা। শঙ্করাচার্যের যদি আট বছরেই পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ হয়ে থাকে,—

ত্রিবেদী। শ্রীগণেশ, এর যুক্তি আপনার মাথায় নিশ্চয়ই ঢুকছে না ?

গণেশ। না।

ত্রিবেদী। ঢোকবার কথা নয়। অসাধারণ এর যুক্তি ! [মমতার দিকে চেয়ে] বাঃ ! বাঃ ! বাঃ ! তোমাকে আমার স্যালিউট্।

মমতা। আমার বয়েস তখন ষোল। কে বিচার করবে আমার ভালমন্দ বিচার করবার মত বুদ্ধি তখনই হয়েছিল কিনা ?

ত্রিবেদী। ভগবান।

মমতা। মানুষ এর বিচার করতে বসলে ?

ত্রিবেদী। ভুল হতেই পারে।

মমতা। তাই স্বীকার করুন।

ত্রিবেদী। তুমি আমার মুখ থেকে স্বীকার উক্তি করিয়ে নেবে ?

গণেশ। ঝানু মেয়ে !

ত্রিবেদী। শ্রীগণেশ, মানুষের বিচার আপনি করেন নি, মানুষ আপনি চেনেন না। আর বসা নয়, উঠুন। আমিও উঠি।

[উভয়েই উঠে দাঁড়ালেন]

মমতা। বাবা বসিয়ে গেলেন; আমার ওপর রাগ করে চলে যাবেন?

ত্রিবেদী। তোমার কাছে তর্কে আমি হেরে গেলুম। দিগ্-বিজয়িনীর সার্টিফিকেট চাও? লিখে দিয়ে যাচ্ছি।

মমতা। আপনি আমার বাবার মতন। বাবার কাছে মেয়ে আশীর্বাদই চায়।

ত্রিবেদী। তাই দিয়ে যাব। একদিন তোমার কান্না দেখে যে ব্যথা পেয়েছিলুম, আজও সে ব্যথা আমি ভুলিনি; তাই চাবুক হাতে ছুটে এসেছিলুম, কেবল তোমাকে রক্ষা করব ভেবে। এখানে এসে, তোমার মুখে শঙ্করাচার্যের নাম শুনে, অভিমান আমার ভেঙ্গে গেল। তোমাকে রক্ষা তিনিই করবেন, তোমার কল্যাণ বিধান তিনিই করবেন।

[মমতা নত হয়ে ত্রিবেদী সাহেবের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করল।]

ত্রিবেদী। কল্যাণ হোক। তোমার ভাল হোক। তবে আসি।

মমতা। বাবার মত আশীর্বাদ ক'রে গেলেন, আপনাকে কি আমি না খাইয়ে ছেড়ে দেব?

ত্রিবেদী। না, না, না, আমরা অসময়ে এসে পড়েছি, নিমন্ত্রণ ত সেই রাত আটটায়!

মমতা। গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথিসেবার কি আর সময় অসময় আছে?

ত্রিবেদী। না, না, এখন থাক।

মমতা। শুধু দু' গেলাস সরবৎ।

ত্রিবেদী। শুধু দু'গেলাস সরবৎ? আচ্ছা আন।

[মমতা যাচ্ছিল]

ত্রিবেদী। তুমি বড় ভাল মেয়ে!

মমতা। [ফিরে দাঁড়িয়ে] কি?

ত্রিবেদী। আচ্ছা আন, দু' গেলাস সরবৎ।

[মমতা চলে গেল।]

গণেশ। আপনাকে ত' ঘোল খাইয়ে দিয়ে গেল; এর ওপর আবার সরবৎ?

ত্রিবেদী। ছেলেটি দেখছি নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়েছিল। এই মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ঠেকায় কে?

গণেশ। ঘটনাটি কি ঘটেছিল?

ত্রিবেদী। এই ঘটনা নিয়ে এক সময় খুব হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল; কাগজে কাগজে বিস্তারিত করে ছাপা হয়েছিল ঘটনার বিবরণ

গণেশ। এমন!

ত্রিবেদী। আপনি জানেন না?

গণেশ। কাগজ পড়ার আমার বাই নেই।

ত্রিবেদী। গুজবেও কান দেন না?

গণেশ। তা একটা দুটো কথা কানে এসে পড়ে বৈকি।

ত্রিবেদী। তবে এ কথাও কানে এসে থাকবে। ভেবে দেখুন ত, কোন একটা রেল ষ্টেশনের ঘটনার কথা?

গণেশ। মনে পড়ছে যেন। 'কি যেন ছিল রেল ষ্টেশনটির নাম?

ত্রিবেদী। আমারও মনে পড়ছে না, কি যেন—

গণেশ। ষ্টেশনটিতে যাত্রীদের ভিড় ছিল, নয়?

ত্রিবেদী। সেদিন সেখানে ছিল শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

গণেশ। ষ্টেশনে একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়?

ত্রিবেদী। হয়নি, হতে পারত। কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে এই মেয়েটি লাইন পার হয়ে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে আসছিল।

গণেশ। তখন সন্ধ্যের ঝোঁক?

ত্রিবেদী। অন্ধকারে কেউ দেখতে পায়নি, কখন হুস্ হুস্ করে আল্‌গা একটা ইঞ্জিন এসে পড়ল।

গণেশ। যাত্রীদের ওপর!

ত্রিবেদী। প্ল্যাটফর্মের উপর ভিড়ের ভিতর থেকে একটি ছোকরা লাফিয়ে পড়ল—

গণেশ। চলন্ত ইঞ্জিনের সামনে?

ত্রিবেদী। জনতা পাথরের মত নিশ্চল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল;—ছেলেটি লাফিয়ে পড়েই, মেয়েটিকে তুলে লাইনের বাইরে ফেলে দিলে,—

গণেশ। আর নিজে?

ত্রিবেদী। পার হতে গিয়ে খোয়ায় পা হড়কে লাইনের উপর পড়ে গেল।

গণেশ। ইঞ্জিনটা?

ত্রিবেদী। অলৌকিক ঘটনা যদি মাঝে মাঝে ঘটে ত সেদিনও ঘটেছিল একবার।

গণেশ। ছেলেটি রক্ষা পেল?

ত্রিবেদী। ইঞ্জিনের শক্তিশালী ব্রেক, ইঞ্জিন চালকের দক্ষ হাত দুই-ই সেদিন এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

গণেশ। বেঁচে গেল?

ত্রিবেদী। ছেলেটির গা থেকে এক আঙ্গুল মাত্র তফাতে এসে ইঞ্জিনের চাকা থমকে থেমে গেল।

গণেশ। তার গায়ে একটু চোট লাগল না?

ত্রিবেদী। পড়ে যেতে কপালটা বুঝি কেটেছিল।

গণেশ। ডানপিটে ছেলেদের কপাল কোন না কোন উপলক্ষে কাটবেই একবার।

ত্রিবেদী। তাকে ডানপিটে বললে খুব ভুল করা হবে; ছেলেটি ছিল অতি শান্ত, পড়াশোনায় ফার্স্ট হওয়া ছাত্র।

গণেশ। আপনি তবে কাকে চাবকাতে চাইছিলেন, এই মাত্র?

ত্রিবেদী। এই জাতের ছেলেদের অধঃপতন প্রথমেই রোধ করতে না পারলে আর রক্ষে নেই।

গণেশ। ছেলেটির বাপ কে?

ত্রিবেদী। একজন নাম-করা অধ্যাপক। তিনি আর তাঁর ঐ ছেলে—এই দু'টিতে তাঁর সংসার।

গণেশ। ছেলের মা?

ত্রিবেদী। বাপ মৃতদার। রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত; কামিনী-কাঞ্চনে বৈরাগী। ছেলেটিকেও সেই আদর্শে মানুষ করছিলেন। বাপ আর ছেলে; পরীক্ষা আর পড়া; সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়াটি যেন পুস্তকের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

গণেশ। খাঁচার পাখীর মতন ছেলের মনটাকে পোষ মানানোর চেষ্টা!

ত্রিবেদী। সেই খাঁচাব পাখীটির খাঁচাব উপব একটি বনের পাখী সেই রেল স্টেশনের ঘটনার ঝড়ে উড়ে এসে বসল। আশ্চর্য মানুষের মন! যে ছেলেটি জীবনে কোনদিন কোন মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়েও দেখেনি, সেই ছেলে, বাপেব কথা ভাবল না; খাঁচা খুলে একেবারে উড়ে গেল। তারপর একমাস দু'টিতে একেবারে নিরুদ্দেশ!

গণেশ। মেয়েটি আসছে।

[মমতা একটি ট্রে নিয়ে এল।]

ত্রিবেদী। এর নাম দু'গেলাস সরবৎ?

মমতা। মা সাজিয়ে দিলেন।

ত্রিবেদী। ও, মা দিলেন? তবে আব কথা কি! নেপথ্য থেকে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে সসম্মানে গ্রহণ করলুম, তাঁর এই আতিথেয়তা। আসুন শ্রীগণেশ।

[মমতা সাজিয়ে দিলে, উভয়ে খেতে আরম্ভ করলেন।]

ত্রিবেদী। মায়ের আজ আনন্দের দিন; তাঁর এই আনন্দে যোগ দিতে পেরে, আমারাও খুব আনন্দিত।

মমতা। আজ চার বছর মা শুধু কেঁদেছেন।

ত্রিবেদী। মায়ের মন!

মমতা। বাবাব ত পাগল হয়ে যাবাব মত অবস্থা।

ত্রিবেদী। তিনি ভুলেব মাশুল দিচ্ছেন।

গণেশ। আর তুমি?

মমতা। আপনাব বোধহয় মেয়ে নেই?

ত্রিবেদী। [গণেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে] জবাব পেযেছেন?

[উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে খেতে লাগলেন।]

ত্রিবেদী। একেবাবে চুপ কেন?

গণেশ। এমনি একটি সুন্দব সকালে আব একটি নিমন্ত্রণ খাওযাব কথা মনে পডছে।

ত্রিবেদী। ও ব্যাপাবে আপনি পাবদর্শী।

গণেশ। সেটা ছিল অন্নপ্রাশনেব নিমন্ত্রণ, এক মন্দিব-প্রাঙ্গণে বসে নবজাত একটি শিশুব সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওযা।

ত্রিবেদী। পবিবেশটি ত বেশ।

গণেশ। খেতে খেতে একজন বলে উঠলেন—দেখ, শিশুটিকে দেখলে মনে হয যেন যোগভ্রষ্ট একটি ঋষি।

[মমতা যেন একটু চমকে উঠল।]

ত্রিবেদী। তুমি চমকে উঠলে কেন?

মমতা। যোগভ্রষ্ট মানে কি?

ত্রিবেদী। [শ্রীগণেশকে দেখিয়ে] একে জিজ্ঞেস কর।

গণেশ। আমার ঘবে একখানি ছবি আছে, ববিবর্মার আঁকা শকুন্তলার জন্ম। ছবিতে আঁকা সেই মেয়েটিব মুখেব সঙ্গে তোমার মুখের কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে—আচ্ছা তোমার নামটি কি?

মমতা। মমতা।

ত্রিবেদী। মমত্ব-আকৃষ্ট-চেতনঃ।

গণেশ। এইবার মিলটা কোথায় ধরতে পেরেছি।

ত্রিবেদী। আপনার ত গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি, শ্রীগণেশ! আমার মনের উপর একটা নূতন আলোকপাত করলেন!

গণেশ। কোন্ কথায়?

ত্রিবেদী। মাতৃজঠরের অন্ধকারের মত জেল-জঠরের অন্ধকার থেকে কেউ যদি এখন এসে দাঁড়ায়, আর কেউ যদি তাঁকেও যোগভ্রষ্ট বলে সম্বোধন করে বসে?

গণেশ। তাহলে আমারও রবি বর্মার মত চিত্রকর হবার বাসনা জেগে উঠবে।

ত্রিবেদী। সেই বাসনা আপনিই আমার মধ্যে তীব্র করে তুললেন।

গণেশ। আপনি কি ছবি আঁকেন?

ত্রিবেদী। মনে মনে, তুলিতে নয়—ভাষায়

গণেশ। আপনি একজন লেখক?

ত্রিবেদী। আগে কখন লিখিনি ; লিখেছি শুধু রায়, দীর্ঘ দীর্ঘ রায়। অবসর নেবার পর থেকে হাত চুলবুল করতে লাগল ; আর ত লিখতে পাই না ; তাই সাহিত্যিক হবার নেশা পেয়ে বসেছে। লিখেছিও কিছু, কিন্তু হয়নি কিচ্ছু! একটা লেখবার খোরাক, খুব উঁচুদরের একটা উপাদান খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। আজ পেয়ে গেলুম।

গণেশ। আপনি কি লিখবেন?

ত্রিবেদী। একটা কালজয়ী উপন্যাস! [মমতাকে] তার নায়ক কে হবে জান? ঐ যাকে যোগভ্রষ্ট বলে সম্বোধন করবার জন্যে আমার মনটা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল ; আমারি দণ্ডাদেশ ভোগ করে সে এবার আসছে, আমার গল্পের নায়ক হয়ে। আর নায়িকা? নায়িকা হবে তুমি।

মমতা। আপনি আমাদের নিয়ে গল্প লিখবেন?

গণেশ। নায়ক হল, নায়িকাও হল, এবার তাহলে গল্পের নামটা কি হল শোনা যাক্।

ত্রিবেদী। সেটা লেখা শেষ হবার পর। এখন কেবল শিরো-নামায় লিখে রাখব,—"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" সেই উৎসমুখে আমার গল্পের হবে সুরু—। আমি চললুম।

গণেশ। খাওয়া শেষ করে যান।

ত্রিবেদী। আনন্দে আমার মন লাফিয়ে উঠেছে যে, আর খাওয়ায় মন নেই।

গণেশ। ঘোলের সরবৎটা অন্ততঃ।

ত্রিবেদী। অবশ্য। [ঘোলের সরবৎটি খেলেন]

গণেশ। ঘোল আপনি সত্যিই খেলেন।

ত্রিবেদী। [মমতাকে] তুমি এস একদিন,—কি যেন নাম ছেলেটির ?

মমতা। অমিতাভ।

ত্রিবেদী। অমিতাভ। মানে—। ঠিক হবে—ঐ নামেই আম উপন্যাস লিখব ; আর তোমাদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে পড়ে শোনাব ; আব তোমাদের কথা শুনব।

মমতা। শুধু সেই একমাসের কথা যদি বলি, বলতে বলতে ফুরবে না। কখন নদীতে নৌকায় চড়ে, কখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে, কখন সবুজ ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিয়ে যত গল্প জমে উঠেছিল,—

ত্রিবেদী। উদ্গ্রীব হ'য়ে সব আমি শুনব—সব আমি লিখব।

গণেশ। একটা গল্প এইখানেই হ'ক না ?

ত্রিবেদী। [তিরস্কারের সুরে] খাওয়া হ'ল আপনার ? উঠুন।

গণেশ। এই দেখ মা, সব খেলুম। খুব খেলুম।

ত্রিবেদী। তা আমরা দেখলুম। —এইবার উঠুন। [মমতাকে] তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড কাটিয়ে আজকের সকালে একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দ বহন ক'রে নিয়ে চললুম। বাবাকে আমার ধন্যবাদ দিও ; তাঁর গৃহে প্রাতরাশ করে গেলুম। মাকে আমার নমস্কার দিও। আর তুমি ? তোমাকে নিয়ে আমার সাহিত্য-সৃষ্টি সার্থক হ'ক। চলুন শ্রীগণেশ।

[উভয়ে চলে গেলেন]

[কমলার প্রবেশ]

কমলা। আপদ গেল ?

মমতা। আপদ কেন বলছ ?

কমলা। তোমার বাবার বুদ্ধিকে বলিহারি ! এই সব নেমন্তন্ন করা সকাল বেলা। বাবারে বাবা ! চাবুক নিয়ে কি মাতামাতি ! ভয়ে ত আমি কাঁটা। কে ও ?

মমতা। সার্কাসে দেখনি বাঘের খেলা ? যে খেলায় তার হাতের চাবুকের পটাপট শব্দ ! সে চাবুক কারো পিঠে পড়ে না শুধু বাজনার সুরে সুরে বেজে ওঠে। ঐ ত বাবার গাড়ী এসে গেল। আমি এখানে থাকবো না।

[খাবারের পরিত্যক্ত ট্রেটি নিয়ে মমতা চলে গেল]

[কৃষ্ণকিশোরের প্রবেশ]

কৃষ্ণ। সে লোক দু'টি গেছে ?

কমলা। হাঁ, এই ত গেল।

কৃষ্ণ। যাক্, এই নিয়ে আমার ভাবনা ছিল। তাই আমতাভকে খিড়কির দরজায় নামিয়ে দিয়ে এলুম।

কমলা। এল ?

কৃষ্ণ। এল।

কমলা। কি বললে ?

কৃষ্ণ। একটি কথাও না।

কমলা। তুমি বললে না ?

কৃষ্ণ। সারাটা পথ বকতে বকতে এসেছি।

কমলা। কোন কথার জবাব দিলে না ?

কৃষ্ণ। কাঠের পুতুলের মত কাঠ হয়ে বসে রইল।

কমলা। লজ্জায় !

কৃষ্ণ। সে রকম জড়সড় ভাব নয় ত !

কমলা। চেহারা ঝরে গেছে ?

কৃষ্ণ। রংটা আরও ফর্সা হয়ে গেছে।

কমলা। ফ্যাকাশে? রক্ত নেই?

কৃষ্ণ। সামনে এসে দাঁড়াল, আমার মনে হল যেন সোনার গৌরাঙ্গ এসে দাঁড়াল। এমন সুন্দর লাগল আমার চোখে।

কমলা। জেলে থাকলে কি চেহারা ভাল হয়?

কৃষ্ণ। আগে ত কখন জেল-খাটা ছেলে দেখিনি।

কমলা। আমি যাই দেখি।

কৃষ্ণ। থাক না, দেখবেইত। এব'র সারা জীবন চোখ ভরে দেখবে, এনে যখন ফেলতে পেরেছি।

কমলা। বড় ভাবনা ছিল, হয়ত, আসতে চাইবে না।

কৃষ্ণ। ভাবনা বলে! যাক্ খুব সহজে মিটে গেল।

কমলা। তুমি বলতেই গাড়ীতে উঠে বসল?

কৃষ্ণ। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে একেবারে চেয়েই দেখল না; মুখ তুলে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ভাবতে লাগল। তাবপর চুপ কবে মাথা হেঁট করে গাড়ীতে উঠে বসল'।

কমলা। সে আবার কি? মাথা খারাপ হয়নি ত?

কৃষ্ণ। এই দেখ, একটা অলক্ষুণে ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে দিলে ত। যত ভাবছি ও সব ছাইপাঁশ ভাবনা ভাবব না, তত তুমি ভাবাবেই আমাকে। মাথা খারাপ হওয়া—এমনি কথার কথা কিনা। আজ চার বছর ভাবনায় ভাবনায় এক রাত্রি আমার ঘুম নেই; দুঃস্বপ্নে দুশ্চিন্তায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছি; আমার মাথা খারাপ হল না! আর ঐ সোনার চাঁদের মত ছেলে—আজ চাব বছর খেয়ে আর ঘুমিয়ে, ঘুমিয়ে আব খেয়ে দিব্যি চেহাবা করে ফেলেছে, ওর হবে মাথা খাবাপ! মাথা খারাপ হয়েছে তোমার।

কমলা। আস্তে কথা বল, ও শুনতে পাবে যে।

কৃষ্ণ। কাজের কথা বললে ত আস্তে বলি। মাথা খারাপ করিয়ে দিলে পাগলের মত চেঁচাতে হয়।

কমলা। আমি বলি বিয়ের যখন দিন পাচ্ছ, আজই রাত্রে বিয়েটা দিয়ে দাও।

কৃষ্ণ। আমিও তাই ভেবেছি ; শুভস্য শীঘ্রম্।

কমলা। হাঁ, তারপর দুটো রাত কাটিয়েই, চল আমরা সকলে মিলে বোম্বাই চলে যাই। সেখানে জাহাজের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বোম্বাইয়ে থাকব। তারপর দু'টিকে জাহাজে চাপিয়ে দিয়ে তবে ফেরা।

কৃষ্ণ। একেবারে গড় গড় করে প্রোগ্রাম আওড়ে ত গেলে ; ছেলেটির মত নাও আগে।

কমলা। ওর কিছুতেই অমত হবে না, দেখো। বিয়েতেও না, বিলেত যেতেও না।

কৃষ্ণ। বিলেত যেতে অমত করে এমন ছেলে ভারতবর্ষে আজ তুমি একটিও পাবে না। তবে বিয়ের কথা আলাদা। গান্ধর্ব মতে বিয়েতে কোন ছোকরারই অমত নেই, সামাজিক বিয়েতে সকলেই আগে থেকে বলে বসবে "না"।

কমলা। তোমাকে লেক্‌চার্ ঝাড়তে হবে না। ছেলেটিকে কাছে বসিয়ে, আদর করে, আস্তে আস্তে সব কথা পেড়ে দেখ।

কৃষ্ণ। আমার দ্বারা হবেনা। গাড়ীতে যে রকম গম্ভীর হ'য়ে বসে রইল। একটা হাঁ নয়, হুঁ না ! আমি ত মুখ খুলতেই সাহস করলুম না।

কমলা। তাই বলে কথা বলার সময় পালিয়ে গেল ? তুমি জেলখানার ফটকে দাঁড়িয়েই দেশশুদ্ধ লোককে সাক্ষী করে চেঁচিয়ে বিয়ের কথা বললে না কেন ?

কৃষ্ণ। তুমি যদি সবেতেই ধমকে কথা বল, আমি আর কি বলব বল ?

কমলা। তোমাকে কোন কথা বলতে হবে না, যা বলবার আমিই বলব। তুমি ছেলেকে ঘরে এনে তুলেছ—এই যথেষ্ট। এবার যা,

ক'রবার আমিই ক'রব। তুমি এখন বাজারে যাবে? কেনা-কাটা কিছু করবে?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, যেতেই ত হবে। আর সময় কোথা? আয়োজনটা ত কম নয়।

কমলা। কত আয়োজন ক'রতে হবে? দেশশুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে বসে আছ ত?

কৃষ্ণ। না; তা হ্যাঁ, শতাবধি লোক হবে।

কমলা। এ তোমাব পাগলামি নয়? বিয়ের কিছু ঠিক নেই!

কৃষ্ণ। নেই? নেই কেন?

কমলা। নেই কেন? তবে কথাটা পাকা কব।

কৃষ্ণ। আমি চাই সমাজেব চোখে বিয়েটাকে পাকা করতে, তাই এত লোক ডাকা।

কমলা। তুমি একা মানুষ, পারবে একটা বিযের আয়োজন একদিনে ক'রে ফেলতে?

কৃষ্ণ। পাডার ছেলেদেব ডেকে আনছি।

কমলা। পাডার ছেলেদের আবার ডাকবে?

কৃষ্ণ। যা করব, বুক ফুলিয়ে করব; পাঁচজনকে দেখিযে কবব; আমাদেব ভয় কি?

কমলা। সবাই আদর যত্নেব কাঙাল; পাডার ছেলেদের ডাক, ভাল করে খাওয়ানো দাওয়ানোর আযোজন কব; দেখবে ওবাই আবার কোমর বেঁধে বিয়ে তুলে দিয়ে যাবে।

কৃষ্ণ। ওরা দু'টিতে এই দিকে আসছে যে! তুমি দেখ ওকে; আমি বাজারে চললুম।

[কৃষ্ণকিশোর ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন]

[অমিতাভ ও মমতার প্রবেশ]

মমতা। এই দেখ মা, কে এসেছে। এসে অবধি তোমার কাছে আসবার জন্যে ব্যস্ত। বাবার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কি আলোচনা করছিলে? আমরা আসতে পারছিলুম না!

কমলা। এই তোদের কথা ছাড়া আর আমাদের কি কথা আছে বল্‌?

মমতা। মাকে প্রণাম করবে না?

[অমিতাভ উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল]

কমলা। প্রণাম করবার সময় ত পালিয়ে যায়নি বাবা। তুমি আমাদের ঘর আলো করে চিরদিন থাকবে। আমাদের ছেলে নেই, ছেলের অভাব পূর্ণ করবে। বস।

[অমিতাভ বসল কমলা পাশে বসলেন]

কমলা। মা হয়ে খুঁড়তে নেই; তোমায় দেখলে কে বলবে যে ...বলবে. পশ্চিমের কত পাহাড় বেড়িয়ে কত তীর্থ ঘুরে এলে।

মমতা। মা, আবার তুমি ওর চেহারার সুখ্যাত করছ! প্রথম যেদিন ও এসেছিল আমাদের বাড়ীতে তুমি ওর চেহারার কত সুখ্যাত করেছিলে, তাই ওকে হারাতে হয়েছিল,...

কমলা। তুই যা দিকিনি এখান থেকে, যত সব অলক্ষুণে কথা মেয়ের!

মমতা। বেশ যাচ্ছি।

কমলা। শোন্‌, ওর স্নানের ব্যবস্থা কর দিকিন গিয়ে।

মমতা। ও খাবে আগে; স্নানের ব্যবস্থা পরে।

কমলা। বেশ তুই তাই সাজিয়ে নিয়ে আয় তোর মনের মতন করে। আমি ততক্ষণ একটু গুজ্‌ গুজ্‌ ফুস্‌ফুস্‌ করি ছেলের সঙ্গে।

মমতা। তাই কর। [মমতা চলে গেল]

কমলা। ভাল ছিলে বাবা?

অমিতাভ। আমার বাবার কি হ'য়েছিল?

কমলা। তোমার বাবার অসুখটা যে কি হল শেষটা...

অমিতাভ। আপনারা গেছলেন?

কমলা। আমরা না...হাঁ...অসুখটা ত তেমন কিছু...

অমিতাভ। মরবার সময় আমার নাম করে একবার ডেকেছিলেন?

[কমলার আর মুখে কোন কথা এল না। চোখে বুঝি একটু জল এল। চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন,—]

কমলা। বাবা, মধ্যপথে তোমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। উনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাকে বিলেতে পাঠাবেন। তোমার পড়াশোনা সেখানেই গিয়ে সাঙ্গ করবে। সব খরচের ব্যবস্থা উনি করেছেন।

অমিতাভ। বাবাকে কি সৎকার সমিতির গাড়ীতে করে নিয়ে গেল ?

কমলা। না, না, তা কেন। তাঁর অত ছাত্র।

অমিতাভ। ছাত্রেরা ত' সব বিদ্রূপ করেছিল, আমাকে নিয়ে ?

কমলা। কৈ না, আমরা ত' সে সব কিছু শুনিনি।

অমিতাভ। মরবার সময় কেউ ত' তাঁর কানের কাছে বিদ্রূপ করতে যায়নি ?

কমলা। সাধ্য কি ! মিশনের সাধুরা তখন তাঁকে ঘিরে বসে…

অমিতাভ। সাধুরাই তাঁর শেষ কাজ করলেন ?

কমলা। পাঁচজনে এসে পাঁচকথা শুনিয়ে যেতে লাগল। তিনি ছিলেন ঠাণ্ডা মানুষ, কারো সঙ্গে ত ঝগড়া করতে পারতেন না। নিজেই শেষে বসত বাড়ী ছেড়ে মিশনের আশ্রয়ে গিয়ে শেষ কালটা ছিলেন।

অমিতাভ। বাবা কি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন ?

কমলা। একমাত্র তাঁর ঐ বসত বাড়ীখানি, তা তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করে দিলেন। সেই ত এক রকম সন্ন্যাসী-ফকির হওয়া।

অমিতাভ। বাবা আমায় পথ দেখিয়ে গেলেন।

কমলা। পথে কেন তুমি বসবে বাবা ? মেয়ে বল, ছেলে বল আমাদের ঐ একটি ; ওর জন্যেই আমাদের বাঁচা ; আর মমতা সে ত শুধু তোমার জন্যেই প্রাণটা ধরে রেখেছে। আমাদের যা কিছু সব তোমার থাকবে।

অমিতাভ। সন্ন্যাসীদের অশৌচ কি আমরণ হয়?

কমলা। তোমার বাবার বাড়ী-ভর্তি বই ছিল। সব মিশনের সাধুরা নিয়ে গেছেন। সেগুলি তাঁরা বিক্রি করেন নি, যেমন তেমনি আছে। তুমি বইগুলি চেয়ে এন; তুমি চাইলেই তাঁরা দিয়ে দেবেন। আমাদের এই বাড়ীখানি ত যথেষ্ট বড়! এর একটা দিক্ তোমার জন্যে রাখা আছে। তুমি এখানে বইগুলিকে এনে আবার তেমনি করে সাজিয়ে ফেলবে। কেমন, এই ব্যবস্থা তোমার পছন্দ?

অমিতাভ। [মনে হল যেন আত্মসংবরণ করতে চায়] ইন্ বুকস্ এ্যাণ্ড টেম্পল্স্ ভেন্ দাই সার্চ। *

[কমলা উঠে অমিতাভের দিকে পিছন করে চোখ মুছতে লাগলেন, তারপর নিজেকে সুস্থ করে আবার অমিতাভের পাশে বসলেন।]

কমলা। উনি বলেন--অমিতাভ আমাদের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। বিলেত থেকে গোটাকতক বড় বড় ডিগ্রী নিয়ে ফিরবে যখন, তখন দেখো, এই দেশের লোকই ওকে আবার মাথায় তুলে নেবে। [কিছুক্ষণ থেমে] কি নেবে না?···মাথা নাড়ছ কেন? [কিছুক্ষণ থেমে] তোমাকে কি একলা পাঠাব মনে করছ? না, না, না। মমতাও যাবে তোমার সঙ্গে। সব সময়ে ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। [কিছুক্ষণ থেমে] আর পড়তে তোমার ভাল না লাগে, পড়বে না। বেড়িয়ে বেড়াবে, যেখানে খুশী, যতদিন খুশী ছুটিতে ঘুরে বেড়াবে। সব খরচ জোগাব আমরা এখান থেকে, একটুও এলবো না। [কিছুক্ষণ থেমে] যখন যেমন খরচের দরকার হবে, একটুও লজ্জা করবে না, নিজের মতন মনে করে চেয়ে পাঠাবে। আব্দার করবে—জুলুম করবে।—এত কথা বলছি তোমার মুখে রা নেই, একটুও হাসি নেই, কেন বাবা?

* In books and temples vain thy search
-The Song of the Sannyasin : স্বামী বিবেকানন্দ।

অমিতাভ। বাবার শ্রাদ্ধ সন্ন্যাসীদের মত হল না গৃহীদের মত ?

[কমলা মুখ ফিরিয়ে কপালে হাত দিয়ে একবার "উঃ!" ধ্বনি করলেন। বোধহয় চোখে জল এল।]

অমিতাভ। বাবার অস্থি গঙ্গায় দেওয়া হয়েছিল ?

কমলা। এতক্ষণে তুমি বুদ্ধিমানের মত একটা কথা বললে।

অমিতাভ। কি ?

কমলা। যাঁদের অস্থি গঙ্গায় দেওয়া হয়, তাঁরা কোথায় যান্ ?

অমিতাভ। কোথায় ?

কমলা। তোমার বাবা কোথায় গেছেন ?

অমিতাভ। কোথায় ?

কমলা। স্বর্গে। আজ তিনবছরের উপর হতে চলল তিনি স্বর্গে আছেন। পরম নিশ্চিন্তে, পরম আনন্দে। তুমি এখানে এমন করে কাতর হলে, স্বর্গে তিনি কাতর হয়ে পড়বেন না ?

অমিতাভ। বাবার অস্থি গঙ্গার জলে মিশে গেছে ?

কমলা। তিনি বন্ধনমুক্ত হয়ে চলে গেছেন, আবার কেন তাঁকে মায়ার বন্ধনে টানছ' ?

অমিতাভ। কোথাও গেলে আর তাঁকে দেখতে পাব না ?

[আবার কমলার চোখে জল এসে গেল, চোখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন]

কমলা। তোমার বাবার আর মায়ের দু'খানি ছবি আমরা আনিয়ে রেখেছি। বাকী সব আসবাবপত্র সাধুরা নিলেমে বেচে দিলেন ; সে সব পুরোনো সেকেলে। কি হবে! আমরা শুধু ঐ দুইখানি ছবি কিনে আনলুম। ছবি দু'খানি জীবন্ত, যেন কথা কইছে! দেখবে ? মাকে তোমার মনে নেই ? মমতাকে ডাকব, দেখবে গিয়ে বাবাকে ?

[অমিতাভ আত্মসংবরণ করতে লাগল। ঠোঁট দু'টি চেপে সে কান্না রোধ করতে চায়]

কমলা। দেখবে বাবাকে ?

অমিতাভ। ছবিতে?

কমলা। মমতাকে ডাকব, নিয়ে দেখাবে?

[অমিতাভ উঠে গিয়ে কমলার দিকে পিছন করে দাঁড়াল; পাছে তার চোখের জল কমলা দেখতে পায়। চোখের জল রোধ করতে আর মনে বল পেতে সে আবৃত্তি করতে লাগল]

অমিতাভ। "দে নো নো ট্রুথ হু ড্রীম সাচ্ ভেকাণ্ট ড্রিমস্ য়্যাজ্ ফাদার্ মাদার্ চিলড্রেন্ ওয়াইফ্ এণ্ড ফ্রেণ্ড।"

কমলা। [কপাল চাপড়ে—] এই আমার মাথা খেলে! ভুল বকে যে! [কমলা কেঁদে ফেললেন, চেঁচিয়ে ডাকলেন,—] মমতা মমতা!*

[মমতা ছুটে এল]

মমতা। ডাকছ মা?

কমলা। এক কাপ চা করে আনতে তুই যে বছর ঘুরিয়ে দিলি? আর তোর চা করে কাজ নেই, বস্ এইখানে। আমি চা করে আনছি। বসে ব'সে গল্প কর এর সঙ্গে।

[কমলা চলে গেলেন]

অমিতাভ। মা কাঁদলেন কেন?

মমতা। মা কাদের জন্যে কাঁদে, মায়ের আদর কখন তুমি পাওনি, তুমি কি বুঝবে?

[কমলা ফিরে এলেন]

কমলা। এসেই ঝগড়া শুরু করলি? এই জন্যেই কি তোকে বসিয়ে গেলুম?

মমতা। কি করব, তোমাদের ছেলে যদি পাগল হয়?

---

* "They know no truth who dream such vacant dreams
As father, mother, children, wife and friend."

The Song of the Sannyasin—স্বামী বিবেকানন্দ।

কমলা। কি বললি পাগল? আমার এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে তুই বললি পাগল! তোর বাবা পাগল।

[অমিতাভ হেসে ফেলল]

কমলা। দেখ দিখিনি, বাছার মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাসা এমনি করে গল্প ক'রে ওকে হাসা দিকিন একটু। আমি চা করে আনছি।

[কমলা চলে গেলেন]

অমিতাভ। বাবার নাম এখনও কেউ করে?

মমতা। তোমার বাবা আমাকে চাইতে এসেছিলেন।

অমিতাভ। [একটু চমকে] কখন?

মমতা। আমরা যখন ছু'টিতে চম্পট দিয়েছিলুম; যখন খোঁজা-খুঁজি চলছে।

অমিতাভ। তখন? চাইতে কেন?

মমতা। ন্যাকা! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না?

অমিতাভ। [আবার হাসল] খাওয়া যে আমার নিরামিষ।

মমতা। তোমার বাবা আমার বাবার হাত ছু'টি ধ'রে,...

[মমতার চোখে জল এল। নিজেকে একটু সামলে—]

মমতা। অমন মানুষ আর হবে না।

অমিতাভ। কত মানুষ আসে, কত মানুষ যায়! শেষে সবাই সবাইকে ভুলে যায়।

মমতা। ভোলা অমনি কিনা! আমার বাবা তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন; গালমন্দ করেছিলেন; শেষে থানা-পুলিশ করে অনর্থ বাঁধিয়েছিলেন; কিন্তু তবুও কি ভুলতে পেরেছিলেন! তিনি যাবার পর থেকে আমার বাবা প্রতি রাত্রে তাঁকে স্বপ্ন দেখতেন! স্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠতেন; শেষে একটা অসুখ দাঁড়িয়ে গেল। মা আমায় ধমক দিতেন, রাক্ষুসী তুই তোর বাবাকে খাবি। আমি বলতুম, তাঁকে জেল থেকে বের করে না আনলে আমিও অনাসৃষ্টি বাঁধাব, বাঁধাব, বাঁধাব। এমনি করে

চারটি বছর কেটেছে। উঃ! ভাবলে শরীর কেঁপে ওঠে, তুমি আড়ালে ছিলে, আমাদের কষ্ট দেখতে পাওনি।

অমিতাভ। চিত্তের এই বিকার আমার যিনি ডিনামাইট চার্জ করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আমার পরম মিত্রের মত কাজ করেছিলেন।

মমতা। তিনি যে আজ এখানে এসেছিলেন।

অমিতাভ। কে?

মমতা। সেই জজ সাহেব।

অমিতাভ। তিনি কেন?

মমতা। তিনি তোমার জীবন কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখবেন।

অমিতাভ। তাঁর সেই রায়? ছাপিয়ে বই করবেন?

মমতা। না গো, আমাদের সেই একমাসের রোমান্স, শোনবার জন্য তোমাকে আমাকে একসঙ্গে তাঁর বাড়ী নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

অমিতাভ। যেও।

মমতা। তিনি সত্যিই মিত্রের মত ব্যবহার করে গেলেন।

অমিতাভ। তোমার মুখে আমার কাহিনী শুনতে তাঁর আরও ভাল লাগবে।

মমতা। তোমার মনের খবর আমি কি জানি?

অমিতাভ। ভুলে গেছ?

মমতা। ভুলব যদি, চারটে বছর কাটালুম কি নিয়ে?

অমিতাভ। চার বছর ধরে কি কেবল ঐ একই গল্প করলে?

মমতা। আর তুমি? চারটে বছর কাটালে কাকে ভেবে ভেবে?

অমিতাভ। শুনবে আমার কথা?

মমতা। শোনবার সময় পালিয়ে যাচ্ছে?

অমিতাভ। আর আমার গল্প শুনতে চাও না?

মমতা। শুনতে চাইনা ত, আজ চার বছর পথ চেয়ে বসে আছি কিসের জন্যে?

অমিতাভ। তবে শোন আমার গল্প।

মমতা। মা এখনি চা নিয়ে আসছে।

অমিতাভ। তার আগেই আমার গল্প শেষ হয়ে যাবে।

মমতা। ও! তোমার তবে ছোট গল্প।

অমিতাভ। খুব ছোট্ট।

মমতা। জজ সাহেব লিখবেন এক সুবৃহৎ উপন্যাস।

অমিতাভ। ছোট বীজ থেকেই ত বড় গাছ হয়।

মমতা। জজ সাহেব খেতে খেতে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন লেখবার আবেগ এসে গেছে। আবেগের মুখেই লিখতে না বসলে বুঝি লেখার বেগ থেমে যায়?

অমিতাভ। যায়ই ত।

মমতা। তাই আর তোমার সঙ্গে দেখা করবার তর সইল না, ছুটলেন বাড়ী গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসতে।

অমিতাভ। ঠিক! আবেগ চলে গেলে আর আসে না।

মমতা। তুমিও একদিন লেখক হবে?

অমিতাভ। আমার এই গল্পটা যদি তুমি অনুমোদন কর?

মমতা। কোন গল্পটা?

অমিতাভ। এখনই যা বলব বলব করছি, তুমি বলতে দিচ্ছ না।

মমতা। গল্পের কি নাম দেবে?

অমিতাভ। এই ধর, ডিনামাইট?

মমতা। এ আবার কি নাম? আমার পছন্দ নয়।

অমিতাভ। তবে নামটা বাদ দিয়ে গল্পটা শোন।

মমতা। যদি বাঙলা অনুবাদ করে "বিস্ফোরণ" নাম দি?

অমিতাভ। সেটা নাম নয়—পরিণাম ; যদি পরিণামই তোমার পছন্দ, তবে তাই।

মমতা। তাই কি? তোমার গল্পও কি গর্জন করে পরিণামে ফেটে পড়বে? এমন গল্প আমি শুনতে চাই না।

অমিতাভ। যেদিন বাধা-বন্ধনহীন নীল আকাশের সন্ধান আমায় দিয়েছিলে, সেদিন বিস্ফোরণের ভয় তোমার একটুও ছিল না?

মমতা। "খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।"

সেদিন বিধাতার মনে কি খেয়াল চেপেছিল, বল না?

অমিতাভ। আমাকে বন্ধনমুক্ত করে নীল আকাশের তলায় ছেড়ে দেবার। তুমি শুধু স্বর্গের দূতের মতন আমায় ডাক দিয়েছিলে।

মমতা। "বনের পাখী বলে, আকাশ ঘন নীল কোথাও বাধা নাহি তার।" এ মন্ত্র প্রথম কে তোমার কানে দিয়েছিল?

অমিতাভ। তুমি!

মমতা। আমি তোমার সর্বনাশ ডেকে এনেছিলুম।

[মমতার চোখে বুঝি জল এল]

অমিতাভ। প্রথম যখন জজ সাহেবের রায় শুনলুম, আমার কি মনে হল জান?

মমতা। কি?

অমিতাভ। ছেলেবেলায় আমার একবার ফোঁড়া অপারেশান হয়। যতক্ষণ অপারেশান হচ্ছিল চিল চেঁচাচ্ছিলুম। অপারেশান্ হয়ে গেলে ডাক্তার বাব একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, লাগল? আমি একবার বাবার মুখের দিকে একবার ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তারপর ছোট্ট করে বললুম, —"না"।

মমতা। বাবার মুখ চেয়ে বললে, "না", পাছে বাবা কষ্ট পান।

অমিতাভ। রায় শুনতেই, প্রথম চোখ তুলে দেখলুম, বাবা কোর্টরুমে আছেন কিনা। দেখলুম তিনি চলে যাচ্ছেন, তাঁর পিছনটাই শুধু দেখতে পেলুম।

মমতা। একবারও তোমার দিকে চেয়ে দেখলেন না?

অমিতাভ। না

মমতা। আর দেখা হল না।

অমিতাভ। শবদাহ শেষ হলে শ্মশানযাত্রীরা যখন শ্মশান,

ছেড়ে চলে যান, তখন আর একটিবারও ফিরে নেবানো চিতাটির দিকে চেয়ে দেখেন না। আমার বাবাও তেমনি একটিবারও আর আমার দিকে চেয়ে দেখলেন না।

মমতা। তুমি এমন করে বল, যে চোখে জল আনিয়ে ছাড়।

অমিতাভ। তারপর আমি জেলের গাড়ীতে উঠলুম, মনে হল যেন দাহকার্যের পর অশরীরী একটা সত্তা নিয়ে আমি প্রেতলোকে চলেছি।

[মমতা অমিতাভের মুখের উপর হাত চাপা দিল]

মমতা। অমন করে বলো না।

অমিতাভ। [মমতার হাত সরিয়ে দিয়ে] তুমি কি শোন নি, বেঁচে থেকে নিজের শ্রাদ্ধ করবার বিধান আছে?

মমতা। আছে ত আছে, তোমার আমার কি?

অমিতাভ। তোমার বিদ্যে পরীক্ষা করছি, বল না দেখি, মানুষ নিজের হাতে নিজের পিণ্ডদান কখন করে?

মমতা। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে।

অমিতাভ। তবে? তুমি জান না কি?

মমতা। তোমার পেটের কথা।

অমিতাভ। এবার তাই শোন। সন্ন্যাস গ্রহণ, সে যেন জন্মান্তর গ্রহণ; তাই পুনর্জন্ম পাবার আগে পূর্বজন্মের প্রেতকার্য সমাধা করতে হয় নিজের হাতে।

মমতা। এ ত তুমি তত্ত্ব কথা শোনাচ্ছ। গল্প শুনতে বসে তত্ত্বকথা শুনতে ভাল লাগে না।

অমিতাভ। তত্ত্বের সূক্ষ্মসূত্র ধরেই ত গল্পের দানা বেঁধে ওঠে।

মমতা। তেমন মিছরীর দানার মত মিষ্টি লাগছে না কেন তোমার গল্প?

অমিতাভ। তোমার মন নেই শোনবার।

মমতা। আজ চার বছর উন্মুখ হয়ে বসে আছি। আমার মন নেই তোমার কথা শোনবার?

অমিতাভ। তবে শুনছ না কেন মন দিয়ে?

মমতা। তোমার গল্পের মোড়টা একটু ঘুরিয়ে দাও।

অমিতাভ। জেলে তিন দিন তিন রাত কাটাবার পর আমার জীবনে গল্পের মোড় ঘুরে গেল।

মমতা। গল্প বলছ না, নিজের কথা বলছ?

অমিতাভ। চুপ। শোন। প্রথম তিনটে রাত আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি; চতুর্থ রাতে একেবারে অগাধে ঘুম। মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মমতা। নতুন জায়গা।

অমিতাভ। ঘুম ভাঙতেই দেখি সমস্ত ঘরটা আলোয় আলো হয়ে গেছে! ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালুম, দেখলুম,...

মমতা। [ভয়ে ভয়ে] কি?

অমিতাভ। দেখলুম আদিত্য-বর্নং! সামনে দাঁড়িয়ে স্বামী বিবেকানন্দ!

মমতা। প্রত্যক্ষ তাঁকে দেখলে?

অমিতাভ। তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখলুম।

মমতা। মুখের কথা?

অমিতাভ। শুনলুম!

মমতা। কি?

অমিতাভ। আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি বললেন,—

—"নো ম্যান্ হু থিঙ্কস্ অফ্ ওম্যান্

য়্যাজ্ হিজ্ ওয়াইফ্ ক্যান্ এভার পারফেক্ট বি;"*

মমতা। [চমকে দাঁড়িয়ে উঠল] কি বললেন?

অমিতাভ। সে যে আমার ইষ্টমন্ত্র। আর শুনতে চেও না।

মমতা। তবে শোনালে কেন?

* "No man who thinks of woman
As his wife can ever perfect be;"
The Song of the Sannyasin: স্বামী বিবেকানন্দ।

অমিতাভ। একদিন তোমাকে স্ত্রী বলে কল্পনা করেছিলুম, তাই।

মমতা। তোমার মনের কল্পনাকে বাস্তব করবার সবই আয়োজন যে করা হয়ে গেছে, বাবার ভোলা মন তোমাকে কি তার কিছুই বলেন নি? [মোড়কটি দেখিয়ে] ঐ দেখ না, কত সখ করে কিনে আনলেন; যাবার সময় মনেও করিয়ে দিলুম; তবু ভুলে খালি হাতেই ছুটলেন তোমাকে আদর করে ঘরে আনতে। আজকালকার দিনে খালি-হাতের আদরে কোন জামাইয়ের কি মন ওঠে? তুমিই বল?

অমিতাভ। [কলাপাতার মোড়কটি দেখিয়ে] ওটাতে কি আছে?

মমতা। [মোড়কটি এনে সামনে ধরল] দেখ।

অমিতাভ। খোল দেখি; [মমতা খুলল] মালা। এ মালা তোমার গলায়ই শোভা পায়; পরাই?

মমতা। পরাও।

[মমতার গলায় মালাটি পরিয়ে···]

অমিতাভ। বাঃ! সুন্দর!

মমতা। যেদিন তুমি আমায় প্রথম দেখে চলন্ত ইঞ্জিনের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, সেদিনের চেয়েও কি আজ আমায় বেশি সুন্দর দেখলে?

অমিতাভ। সেদিন তোমায় দেখেছিলুম অন্ধকারের বুকে একটা বিদ্যুৎ ঝলকের মত।

মমতা। আর আজ?

অমিতাভ। আজ তোমায় দেখছি, এই ফুলের মত!

মমতা। কোনটা তোমার পছন্দ।

অমিতাভ। বিদ্যুৎ করে আকর্ষণ, আর ফুল আপনাকে করে উন্মোচন।

মমতা। একেবারে কবির মতন ক'রে বললে, "আপনারে কর উন্মোচন।"

অমিতাভ। এইবার আমার গল্পটা শেষ করে ফেলি?

মমতা। এই ত সবে শুরু। এর আর শেষ নেই।

অমিতাভ। স্বামী বিবেকানন্দকে আমি প্রত্যক্ষ দেখলুম, একথা শুনে তুমি ত কোন তর্ক তুললে না? প্রশ্নও করলে না? বিশ্বাস করলে কিনা তাও বললে না?

মমতা। আমি বিশ্বাস করেছি।

অমিতাভ। বিশ্বাস করেছ? এত সহজ বিশ্বাস কোথায় পেলে তুমি?

মমতা। তোমার বাবার কাছে।

অমিতাভ। কবে গেছলে তুমি?

মমতা। রায় শুনতে গেছলুম সবাইকে লুকিয়ে।

অমিতাভ। ধরা পড়লে বাবার কাছে?

মমতা। তোমার বাবারই গাড়ীতে লুকিয়ে বসেছিলুম।

অমিতাভ। তোমার ভয় নেই, তুমি অভয়!

মমতা। অভয়া?

অমিতাভ। তাই।

মমতা। গাড়ীতে উঠে তোমার বাবা আমায় দেখতে পেলেন না; অথচ আমি সামনেই বসে। তাঁর চোখ খোলা ছিল কিন্তু দৃষ্টি ছিল না।

অমিতাভ। দৃষ্টি ছি: না!

মমতা। তোমাদের ঘোড়াটাও যেন তোমার রায় শুনতে পেয়েছিল; সেও যেন আর চলতে পারছিল না। এমন সময় খুব চিৎকার···

অমিতাভ। কাদের?

মমতা। রাস্তায়···গাড়ীর পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে সব আসছে।

অমিতাভ। তারা সব ছাত্র, কলেজের ছাত্র, বাবার ছাত্র।

মমতা। তখন তোমার বাবার দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে।

অমিতাভ। সব অনাসৃষ্টির মূল!

মমতা। আমায় দেখে একটুও রাগ করলেন না, শুধু বললেন,

আমার গাড়ীতে তুমি এলে মা? আমি ত বাড়ী যাচ্ছি না।...
আমি বললুম,—আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব।
তিনি ঘাড় নাড়তে লাগলেন।

অমিতাভ। বাবা কখন কারো মুখের ওপর 'না' বলতে পারতেন না।

মমতা। আমি তাঁর পায়ের উপর ঝুঁকে পড়ে কেঁদে উঠলুম।

অমিতাভ। ঠিক সেই জেদ।

মমতা। তিনি একটুও উত্যক্ত হলেন না, আমার কান্না দেখে আমারি দিকে চেয়ে রইলেন; রাস্তার অত চেঁচামেচি, অত ভেংচানি, সে সব যেন আর তাঁর কানে গেল না।

অমিতাভ। তুমিই তখন তাঁকে আড়াল করে দাঁড়ালে অভয়ার মত!

মমতা। গাড়ী এসে থামল' বেলুড় মঠে।

অমিতাভ। বাবার শেষ গন্তব্য!

মমতা। সেখানে যে দৃশ্য সেদিন দেখেছিলুম! [একটু থেমে] মাঝে মাঝে যখনি সেদিনকার সেই দৃশ্য মনে পড়ত, মনটা স্নিগ্ধ হয়ে যেত। [একটু থেমে] হালকা মেঘের মত গানে গানে মনটা যেন কোথায় ভেসে যেতো [যুগ্মকরে আবৃত্তি করল]

"ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ—
ওরে দীন, তুই জোড় কর করি'
কর তাহা দরশন।"

অমিতাভ। সেই করুণা তুমিও তবে পেয়েছিলে?

মমতা। সেই করুণা জেলের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে সহস্র ধারায় তোমার মাথার উপর ঝরে পড়ল'; কিন্তু একবিন্দুও আমি পেলুম না। আমি কত কাঁদলুম, কত পায়ে ধরে মিনতি করলুম; তাঁরা আমায় তোমার বাবার কাছে থাকতে দিলেন না, ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। একলাই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলুম।

অমিতাভ। তবে ত বাবার অনুমতি আমি পেয়েছি?

মমতা। কিসের অনুমতি?

অমিতাভ। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভুকেও মায়ের অনুমতি নিতে হয়েছিল।

মমতা। তোমার বাবা আর বাড়ী ফিরলেন না, মঠেই রয়ে গেলেন। আমি যে এত কান্নাকাটি করলুম, আমাকে তাঁরা কিছুতেই রাখলেন না, ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। আমার ব্যাকুলতা তাঁরা বুঝলেন না!

অমিতাভ। না পাওয়ার জন্যে যে ব্যাকুলতা, সে যে পাওয়ার চেয়েও বড়। যদি বৈষ্ণব সাহিত্য মন দিয়ে পড়, যদি সেই থেকে একটুখানি মধু আস্বাদন করতে পার, তোমার জীবন মধুময় হয়ে উঠবে!

মমতা। সেই মধুর আস্বাদ তুমি কি পেয়েছ?

অমিতাভ। পেয়েছি!

মমতা। চার বছরের অদর্শনে কার বিরহে তোমার মন বিধুর হয়ে উঠেছিল?

অমিতাভ। স্বামী বিবেকানন্দের!

মমতা। [ছিটকে দুই পা পিছিয়ে গেল] আবার সেই কথা! তাঁকে ত' তুমি দর্শন করেছিলে! প্রখর সূর্যের দীপ্তি নিয়ে তিনি তোমায় দেখা দিতে গিয়েছিলেন অন্ধকার জেলখানায়।

অমিতাভ। সেই প্রথম যা; তারপর চার বছর তিনি আমায় কাঁদিয়েছিলেন আর দেখা না দিয়ে। আর একটিবার দেখা পাবার জন্যে সে যে কি আমার ব্যাকুলতা!

মমতা। আর কারো জন্যে কি তোমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত না?

অমিতাভ। আর কে?

মমতা। শাড়ীর আঁচলের খুঁট, চুলের মিষ্টি একটা গন্ধ, শেষ

কথার ভুলে যাওয়া রেশটুকু, তোমার মনকে কি মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তুলত না ?

অমিতাভ। চার বছরের আকুল প্রতীক্ষার পর আবার তিনি দর্শন দিলেন একেবারে শেষ রাত্রে। এবাব দেখলুম করুণামণ্ডিত ! যেন বরফে ঢাকা পর্বত-শৃঙ্গের মত! এক ঝলকা ঠাণ্ডা হাওয়া আমার শরীরকে শীতল করে দিল। এবার আর কোন কথা নয়, নীরবে আঙ্গুল নির্দেশ করে তিনি দেখালেন, আমি দেখলুম সামনে বরফ ঢাকা হিমালয়ের চূড়া। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলে গেছে একটা পথ। যেন কতকাল আগে এই পথে চলতে চলতে একদিন হারিয়ে গেছলুম,—সেই পথ সেই অতি পরিচিত পথ খুঁজে পেলুম। সেই পথ ধরে জ্যোতির্ময় সেই পরম গুরু আমার চলে গেলেন, আমায় অনুসরণ করতে আহ্বান করে !

মমতা। জেলে কি তোমায় নির্জনে রেখেছিল ? কারো মুখ দেখতে পেতে না ? কারো সঙ্গে ছুটো কথা ? ছু'চারখানা ভাল বইও কি তারা তোমায় পড়তে দেয় নি ? উপন্যাস ? রম্যরচনা ?

অমিতাভ। শুধু স্বামীজীর রচনা 'সন্ন্যাসীর গীত' পড়তুম ; একবার নয়, ছুবার নয়, লক্ষবার হয়ত আবৃত্তি করেছি। ঘুমেব মধ্যেও সেই গান স্বপ্নের মত আমার মনের ওপর ভেসে বেড়াত।

মমতা। তাই বুঝি মার কাছে সেই সব মুখস্থ ঝেড়ে পাণ্ডিত্য দেখাচ্ছিলে ?

অমিতাভ। জেলের ফটক থেকে বেরিয়েই দেখি তোমার বাবা গাড়ী নিয়ে হাজির। গাড়ীতে উঠব কিনা যখন ভাবছি, তখন গাড়ীর ভিতর থেকে কে যেন আবৃত্তি করে উঠলেন—"হ্যাভ্ দাউ নো হোম,—"

মমতা। "হোম ! হোম, হোম, সুইট হোম।" ঘরহারা পথিক, তুমি কি চিনতে পারনি সে কার গলার স্বর ?

অমিতাভ। পেরেছি।

মমতা। বনের পাখীর গান গেয়ে যে তোমায় খাঁচা খুলে নীল

আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিল ?···জলভরা ছুটি চোখ মেলে চেয়ে যে শেষবারের মত নীরবে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছল ? সেই চোখের জলে-ভাসা মুখখানিকে কি তখন তোমার মনে পড়ে গেল ?

অমিতাভ। কাকে ?

মমতা। তাকে—যে তোমার ক্লান্তিতে শান্তি এনে দেবে ?

অমিতাভ। আমার ত' কোন ক্লান্তি নেই।

মমতা। সংসারে চলতে হলে কত রোদ কত বৃষ্টি ! যে চলবে তোমার পিছু পিছু মাথার উপর শীতল আচ্ছাদন ধরে তোমার জীবন-পথে ?

অমিতাভ। আজ থেকে ঐ পরিব্রাজকের পথই আমার পথ ! ঐ পথই আমার আশ্রয় ! ঐ পথ থেকেই আমি শুনতে পেয়েছি তাঁর ডাক। তাঁর সেই ডাক ধরে, তাঁরই মুখনিঃসৃত সেই সন্ন্যাসীর গীত গাইতে গাইতে এবার আমি চলব। যদি এ দেহখানিতে তাঁর কোন প্রয়োজন বাকী থাকে তিনি স্বহস্তে খাদ্য তুলে দেবেন আমার মুখে। আর যদি এ দেহখানিতে সব প্রয়োজন তাঁর মিটে গিয়ে থাকে, তিনি স্বহস্তে আমাব দেহের বন্ধন খুলে দিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিয়ে যাবেন।

মমতা। মা কেন তোমার কথা শুনে কেঁদে উঠলেন, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারলে না ?

[মমতার চোখের জলে গলার স্বর কেঁপে উঠল, সে অমিতাভের মুখখানি হাত দিয়ে চেপে ধরল।]

আমি শুনতে চাইনি তোমার এ গল্প।

[মুখ হতে মমতার হাতখানি সরিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে তাকে একটু তফাতে রেখে অমিতাভ তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।]

অমিতাভ। আমার গল্প বলা শেষ হয়ে গেছে ; তোমাকে আমার যা কিছু বলার ছিল সব শেষ হ'য়ে গেছে।

[অমিতাভ দ্বারের দিকে চলল]

মমতা। [তাকে অনুসরণ করে] আমার ত সব কথা বলা এখনো শেষ হয়নি।

অমিতাভ। কি? [ফিরে দাঁড়াল]

মমতা। [তার চোখ-ভরা জল] আমিও কি তোমার কাছে একেবারে শেষ হযে গেছি?

অমিতাভ। আমি অপরিগ্রহ। যেদিন জেলের মধ্যে স্বামীজী আমায় প্রথম দর্শন দেন, সেইদিনই তিনি আমায় দীক্ষা দিয়েছেন। আমি সন্ন্যাসী।

মমতা। এই কথাটা বলবার জন্যেই কি তুমি জেল থেকে বেরিয়েই আমার সামনে এসে দাঁড়ালে?

অমিতাভ। না; সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে যে মায়ার বন্ধনে একদিন তোমায় বেঁধেছিলুম, নিজের হাতে সেই বন্ধন তোমার উন্মোচন করে দিয়ে যেতে।

মমতা। তবে তাই দাও। [গলা থেকে মালাটি খুলে] এই তোমার বন্ধন নিজের হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে একে পথের ধূলায় ফেলে দিয়ে যাও!

[মমতা মালাটি ছিঁড়ে অমিতাভের পায়ের তলায় ফেলতে লাগল। শেষ টুকরাটি ছেঁড়া হবার পর অমিতাভ ঘুরে দাঁড়াল যাবার জন্য, মমতা তার যাবার পথে পায়ের উপর পড়ল·· ।]

মমতা। আমার এই মাথাও তোমার পায়ের তলায় রাখলুম; তুমি পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে একেও পথের ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যাও।

[মাটিতে মুখ গুঁজে মমতা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অমিতাভ অতি সন্তর্পণে মমতাকে তুলে ধরতে গেল; তার হস্তের স্পর্শ পাবামাত্র মমতা উঠেই অমিতাভের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে—]

"হ্যাভ্ দাউ নো হোম্।···"

[উভয়েই চমকে উঠে পরস্পর পরস্পরের নিকট হতে একটু তফাতে দাঁড়াল। কে, কে এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করল? কেউ নয়, অমিতাভ, তোমারি অন্তর হতে, তোমারি কণ্ঠস্বর হ'তে এই সতর্ক বাণী • স্বতঃস্ফূর্ত

হয়েছে। সেই বীরবাণী আর অমিতাভের স্থির দৃষ্টি মমতাকে যন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চল করে দিল। অমিতাভ তার শেষ মুহূর্তের দুর্বলতা জয় করে ফেলল। তার কণ্ঠস্বর হতে এই বীরবাণী স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বেরিয়ে এল।]

অমিতাভ। হ্যাভ্ দাউ নো হোম,

হোয়াট্ হোম্ ক্যান্ হোল্ড দি, ফ্রেণ্ড ?

দি স্কাই দাই রুফ্ ; দি গ্রাস্ দাই বেড্ ;

য়্যাণ্ড ফুড্ হোয়াট্ চান্স মে ব্রীং—*

[অমিতাভ আর ফিরে না চেয়ে আবৃত্তি করতে করতে দ্বারপথে বেরিয়ে গেল। মমতা পাথর হয়ে গেছে। যতক্ষণ অমিতাভকে পথে দেখা যায়, মমতা দাঁড়িয়ে থেকে দেখল ; যখন আর দেখা গেল না, সে মুখ ফিরাল ; মুখ ফিরাতেই দেখল, মা একটি ট্রে করে খাদ্যবস্তু এনে টেবিলের উপর রাখলেন। মাকে দেখবামাত্র মমতা আবার মমতা হ'য়ে গেল।]

মমতা। আর কার জন্যে এ সব আনলে মা ?

কমলা। কোথায় গেল ?

মমতা। চলে গেছে।

কমলা। বাঃ! মেয়ের ত বেশ কথা, চলে গেছে! যেতে দিলি ?

মমতা। বেঁধে রাখব ?

কমলা। হাঁ বেঁধে রাখবি।

মমতা। [ছেঁড়া ফুলগুলি দেখিয়ে] ঐ দেখ মা তাঁর সকল বাঁধন আমি উন্মোচন করে দিয়েছি।

[কৃষ্ণকিশোর প্রবেশ করলেন]

কৃষ্ণ। তাড়াতাড়ি করে বাজারে ত ছোটালে, বাজারে গিয়ে দেখি মানিব্যাগ নেই। আবার ছুটে আসতে হল।

---

* Have thou no home,
What home can hold thee, friend?
The sky thy roof; the grass thy bed;
And food, what chance may bring—"
The Song of the Sannyasin : স্বামী বিবেকানন্দ

মমতা। বাবা, কেন তুমি বললে তাকে সোনার গৌরাঙ্গের মত দেখতে হয়েছে? শচী মায়ের চোখের জল আবার যে মাটীতে পড়ল? মাগো, তুমি একবার তেমনি করে ডাক না তাকে গলা ছেড়ে,—

"ডাকে শচী মাতা, নিমাই, নিমাই
প্রতিধ্বনি বলে—নাই, নাই, নাই।"

কৃষ্ণ। কি হল কি? সে কৈ?

মমতা। প্রতিধ্বনি বলে—নাই, নাই, নাই।

কমলা। একটা পাগলকে তুমি বুকে করে বাড়ীতে এনে তুললে, সে মেয়েটাকে শুদ্ধ পাগল করে দিয়ে পালিয়ে গেল।

কৃষ্ণ। পালিয়ে গেল? কতক্ষণ গেল? কোন দিকে গেল? আমি ধরে আনছি; আমি খুঁজে আনছি। কাঁদিসনে মা, আমি ঠিক তাকে তোর কাছে ধরে এনে দেব।

[কৃষ্ণকিশোর যেমন বেরোতে যাবেন, মমতা তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল।]

মমতা। একবার তুমি তার পিছু নিয়ে অনর্থ বাধিয়েছিলে; আর আমি তোমাকে তার পিছু নিতে দেব না। তার বাবা যাঁর আশ্রয় তাকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, তার চেয়ে বড় আশ্রয় আর কোথাও নেই। সেইখানেই পরম আনন্দে তাকে থাকতে দাও। আর পিছু ডেকে তার বিঘ্ন ঘটিও না।

কমলা। মেয়ের ত' বেশ কথা!

মমতা। মা গো, তোমাদের নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছে।

[মায়ের বুকের উপর মুখ গুঁজে মমতা ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠল'।—]

[যবনিকা]